২০০২

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ◆ ২১তম সংখ্যা

১৫ মে, ২০০২ ঈসাব্দ

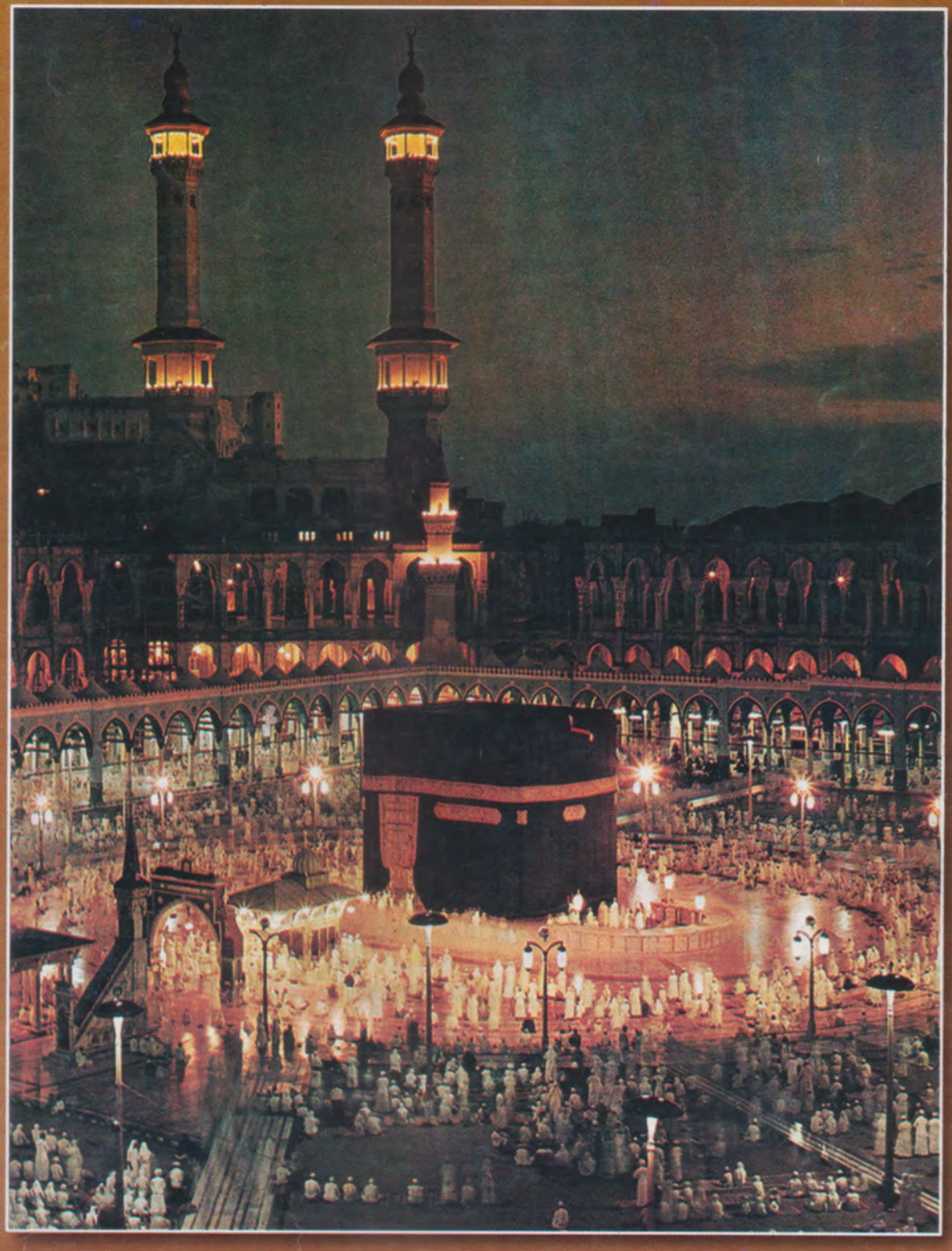

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত রসূলে করীম (সঃ) সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদের অভিমত

◆ "এই পৃথিবীতে যদি কোন মানুষ খোদাতাআলাকে পেয়ে থোকেন, যদি কোন মানুষ সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে খোদাতাআলার ইবাদতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে থাকেন, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আরবের নবী (সঃ)-ই সেই ব্যক্তি।

"মনুষ্য জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত যত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, মুহাম্মদ (সঃ) তার মধ্যে শুধু মহোত্তমই নন সাধুতমও বটে।" *(এ, জি, লিওনার্দ : 'ইসলাম-হার মরাল এ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালু')*

◆ "এটা বলা ভুল যে, তরবারি দিয়েই ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল। ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে কখনই তরবারির ব্যবহার হয় নি। তরবারি দিয়েই যদি ধর্ম প্রচার করা যায়, তবে কেউ উদ্যোগী হয়ে আজকের দিনে তা দেখিয়ে দিলেই তো পারেন।"
(অধ্যাপক রামদেব : 'সম্পাদক, বৈদিক ম্যাগাজিন')

◆ "ইসলামের নবী (সঃ) শুধুমাত্র ব্যক্তি যিনি ধনী ও নির্ধনের মধ্যকার পার্থক্য দূরীভূত করেছিলেন এবং মানবজাতিকে সত্যিকারের সাম্যের শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের জীবনের সর্বস্তরেরই পথ-প্রদর্শনকারী। তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজার চেয়েও বড় ছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ।" *(এইচ, জে, রোস্তমজী, বার এ্যাট-ল)*

◆ "ইসলামের নবী (সঃ) ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভকারী নেতা। আল্ কুরআন যীশু খৃষ্টের ভূয়সী প্রশংসা করেছে, সুতরাং একজন খৃষ্টান হিসাবে আমি ইসলামের নবীকে সম্মান দেখাতে বাধ্য। খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল যখন এই পবিত্র পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পবিত্র মসজিদের মধ্যেই তাঁদেরকে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলিম খলীফাগণের আমলে খৃষ্টান গীর্জাগুলি পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল। এই পবিত্র পয়গম্বরের সহনশীলতার দৃষ্টান্ত এদেশেও অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।"
(দেওয়ান বাহাদুর এস, পি, সিংহ : পাঞ্জাবের খৃষ্টান নেতা)

◆ "মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন সভ্যতার এবং বিশ্বস্ততার একজন আদর্শ পুরুষ। বিশ্বস্ত তাঁর কর্মে, তাঁর কথায় এবং কাজে।" *(টমাস কার্লাইল)*

◆ "এই মহাগুরু (সঃ)-এর চরিত্র মানবতার একটি মহামূল্য সম্পদ"
(ডঃ হরদয়াল, এম, এ, পি-এইচ ডি)

◆ "মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু সেই দাবীই করে গেছেন, যা তিনি প্রথম করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন সবচেয়ে গভীর দর্শন এবং সবচেয়ে সত্য খৃষ্টান ধর্মও এই দাবীকে-তাঁর নবী হওয়ার-খোদাতাআলার একজন সত্য নবী হওয়ার দাবীকে মেনে নিতে সম্মত হবে।"
(বসওয়ার্থ স্মীথ)

◆ "আমি তাঁকে, এই আশ্চর্য মানুষটিকে [মুহাম্মদ (সঃ)-কে] গভীরভাবে জেনেছি; এবং আমার মতে তাঁর খৃষ্ট-বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মত কোন মানুষ যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করেন, তবে তিনি এর সমস্যাবলী ঠিক সেইভাবেই সমাধান করতে পারবেন, যার ফলে পৃথিবীর বুকে চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ইউরোপ মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মমতের প্রতি রীতিমত অনুরক্ত হয়ে উঠেছে এবং একথা বলা যায় যে, ইউরোপের ইসলামীকরণ শুরু হয়ে গেছে।" *(জর্জ বার্ণাড শ')*

◆ "আগ্রহশীলতা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। আগ্রহশীলতার এই মহোত্তম অর্থেই তিনি [মুহাম্মদ (সঃ)] ছিলেন একজন আগ্রহী পুরুষ এবং এই আগ্রহশীলতাই সেই বস্তুত যা জীবিতকালে মানুষকে দূষিত হওয়া থেকে, পচন থেকে রক্ষা করে।" *(স্টেনলি লেন পুল)*

◆ "রাষ্ট্রের অধিপতি, সেই সঙ্গে চার্চেরও অধিপতি হওয়ায় তিনি ছিলেন একই সঙ্গে সীজার এবং পোপ; কিন্তু পোপের ভড়ং ব্যতিরেকেই তিনি ছিলেন পোপ এবং সীজারের সৈন্যবাহিনী ব্যতিরেকেই সীজার। কোন স্থায়ী দেহরক্ষী ছাড়াই, কোন রাজ প্রাসাদ ছাড়াই, কোন নির্ধারিত খাজানা ছাড়াই, যদি কোন মানুষ কখনও এ কথা বলবার অধিকার রাখেন যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে রাজাশাসন করেছেন, তবে তিনি মুহাম্মদ (সঃ)"। *(বসওয়ার্থ স্মীথ)*

রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)

রবিউল আউয়াল মাস বড়ই বরকত ও কল্যাণময়। এ মাসে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন ও ইন্তেকাল করেন। তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন- সারা বিশ্ব-জগতের জন্যে রহমত ও কল্যাণস্বরূপ। এটা অন্য কারও কথা নয়। মহান আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর (সঃ) এ পবিত্র উপাধি। আমরা তাঁর (সঃ) অনুসারী ও অনুগামী। এটা আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, আমরা এ মহান নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। শুধু উম্মত হওয়ার মধ্যে সার্থকতা নেই যদি না আমরা স্বীয় জীবনে তাঁর (সঃ) আদর্শের রূপায়ন করতে পারি। আমরা যদি স্ব স্ব স্থানে- নিজস্ব ভুবনে তথা নিজস্ব পরিমন্ডলে নিজেদেরকে রহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতিচ্ছায়ারূপ রহমত ও কল্যাণের বিকাশ ঘটাতে পারি তাহলে আমরা যে তাঁর (সঃ) প্রকৃত উম্মতের হকদার।

এ রহমতের বিকাশ আমরা বিভিন্নভাবে ঘটাতে পারি- মানবতার সেবা করে, দরিদ্র জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের অভাব-অনটন মোচন করে। বর্তমানে মানুষের মধ্যে অবক্ষয়ের যে ঢল নেমেছে, মানুষ তার প্রভু-প্রতিপালককে ভুলে গিয়ে পার্থিবতার নেশায় মত্ত। কেবল দুনিয়া কামাবার জন্যে মানুষ হন্যে হয়ে ছুটছে। মানুষ নামের জীব এখন মানুষের সবচে' বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ মানুষের জন্যেই এখন মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বনের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকেও মানুষ ততটা ভয় করে না যতটা ভয় করে জানোয়ার-সূলভ মানুষকে। আর এসব কিছু হয়েছে কেবল মানুষের আল্লাহ্ বিমুখ হওয়ার কারণে। একদিন যে মানুষকে তার প্রভু-প্রতিপালকের সামনে তার সব কিছুর হিসেব দিতে হবে সে ব্যাপারে মানুষ একেবারেই উদাসীন। তার মত মানুষের প্রতিও যে তার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা বিস্মৃত হওয়ার কারণে। তাই এখন সময়ের সবচে' বড় দাবী হলো মানুষকে আল্লাহ্মুখী করা। আজ থেকে প্রায় পনরশ' বছর আগে যখন আরব ভূমে এহেন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তখন বিশ্বে রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন-মানুষকে এ দৈন্য-দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্যে। আজ তাই প্রয়োজন তাঁর (সঃ) মত একজন রহমতের কান্ডারীর যিনি মানুষকে পুনঃ আল্লাহমুখী করতে সক্ষম।

পরম করুণার আধার আল্লাহ্তাআলা যথাসময়ে রহমাতুল্লিল আলামীনের একজন প্রতিনিধিকে যথাসময়ে অর্থাৎ আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে মানুষকে আল্লাহ্মুখী করার জন্যে আবির্ভূত করেছিলেন। তিনি এসে মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে এক জামাত গঠন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে গ্রহণ না করার কারণে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও অবক্ষয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং আমরা যারা এ জামাতের সদস্য আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। আমরা যদি মানবতার খাতিরে বিশ্ব নবীর মত ভালবাসার আবেগ নিয়ে মহব্বতের সাথে মানুষকে আল্লাহ্মুখী করার জন্যে দাঈইলাল্লাহ্র কাজ যথাযথভাবে পালন করতে থাকি তাহলে আমরা যে বিশ্ব নবীর উম্মত তা বলা সার্থক হবে। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন রহমাতুল্লিল আলামীনের প্রকৃত উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হই, আমীন।

এ প্রসঙ্গে প্রত্যেক জামাতকে যথারীতি সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা বা আলোচনা সভা করার জন্য অনুরোধ করছি।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী
নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ২১তম সংখ্যা
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১ রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিঃ কাঃ
১৫ হিজরত ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ মে, ২০০২ ঈসাব্দ
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

দুরূদের তাৎপর্য

হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর আশিস পাঠাও, যেরূপ আশিস ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয় তুমি অতীব প্রশংসনীয়, মহামর্যাদাবান।

হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর কল্যাণ পাঠাও, যেরূপ কল্যাণ ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয় তুমি অতীব প্রশংসনীয়, মহামর্যাদাবান।

উল্লেখিত দুরূদ পাঠ করে আমরা কি এটাই প্রমাণ করি যে, ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরকে যে আশিস ও কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে, আমাদের নবী ও তাঁর বংশধরদের আজও তা প্রদান করা হয় নি।

আমাদের নবী করীম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) সকল নবীর নেতা এবং বোধগম্য কারণেই এই বিশ্বাস জন্মাবার কথা যে, তাঁকেই আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী আশিস ও কল্যাণ দান করে থাকবেন।

নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে দুরূদ পাঠ করা ফরয। আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমের সূরা আহযাবের ৫৭ আয়াতে নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে দুরূদ পাঠ করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনিও নবী (সঃ)-এর ওপরে দুরূদ পাঠ করেন, ফিরিশ্‌তারাও পাঠ করেন এবং সকল মু'মিনকেও পাঠ করতে আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু-এর এই আদেশের প্রেক্ষিতেই নামাযে আমরা যে তাশাহ্‌হুদ ও দুরূদ শরীফ পাঠ করি তা রচিত হয়েছে এবং স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় থেকে তাঁর নির্দেশ-মত মু'মিন সমাজ কর্তৃক ইহা পঠিত হয়ে আসছে। হুযূর (সঃ) নিজেও ইহা পাঠ করেছেন। ইহা পাঠ করা ব্যতিরেকে নামায পরিপূর্ণ হয় না। নামাযে দুরূদ পাঠের গুরুত্বের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন বিতন্ডা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

একমাত্র আহমদী জামাতই জোর দিয়ে বলতে পারে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আল্ বা আধ্যাত্মিক সন্তানগণ পরিপূর্ণভাবে দুরূদে প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণ লাভ করেছে। আমরা যে দুরূদ পাঠ করি তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানগণ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের ন্যায় আশিস ও কল্যাণ প্রদানের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করা হয়ে থাকে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ইসহাক ও ইসমাঈল (আঃ)। ইসহাকের বংশে বহু নবী আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) বংশের এক অংশ আশিস ও কল্যাণমন্ডিত হয়েছিলো। হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ)-এর বংশের অপর এক ধারা ইসমাঈলের বংশে নবী - বরং এক বিশেষ নবী আসার জন্যে হযরত ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়েই দোয়া করেছিলেন (সূরা বাকারা ১৩০ আয়াত)। তাঁদের দোয়া পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইসমাঈলী বংশে আবির্ভাবের মাধ্যমে। হযরত নবী করীম (সঃ) স্বয়ং বলেছেন - আনা দা'ওয়াতু ইব্‌রাহীমা অর্থাৎ আমি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফল (জামেউস সগীরের বরাতে ইবনে আসাকির)।

আলোচ্য দুরূদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, নবী আকরম (সঃ)-এর আল্ বা আধ্যাত্মিক সন্তানদের মধ্য থেকে একজন মহান নবীর আগমন বাঞ্ছনীয়; নচেৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর ওপরে আশিস ও কল্যাণ পূর্ণ হয় নি বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরা কুরআন মাজীদ থেকে একদিকে যেমন দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে স্বাধীন স্বতন্ত্র ও শরীয়তধারী নবীর আগমনের পথ বন্ধ - ইসলামের বাইরে থেকে তো বটেই ইসলামের অভ্যন্তরেও (সূরা আহযাব ঃ ৪১ আয়াত)। এ আয়াতের প্রতি তাকালে

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আহযাব (আয়াত ঃ 'খাতামান্ নবীঈন')	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তম চরিত্র	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
■ অমৃত বাণী ঃ মকামে মুহাম্মদ (সঃ) হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'আযীয' সিফতের আরো ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
■ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রসূল (সঃ)-প্রেম মুল- মোকাররম সিদ্দীক আশরাফ আলী	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১০-১২
■ জুমুআর খুতবা ঃ রসূল (সঃ)-প্রেম ও তার মাহাত্ম্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩-১৬
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৭-১৮
■ বিশ্ব-মুসলিমের জন্য চিন্তার কারণ	ঃ অনুবাদ - জনাব চৌধুরী শাহাবউদ্দীন আহমদ	১৯-২০
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২১-২২
■ রসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত্র মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২২-২৪
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৫
■ বড় নবীর ছোট ছোট শিক্ষা	ঃ জনাব মোঃ ফজল-ই-ইলাহী	২৬-২৮
■ নতুনদের পাতা		
● হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর তার পরিবারের উপরে অত্যাচারের ইতিবৃত্ত	ঃ ভাষান্তর - জনাব কওসার আলী মোল্লা	২৯-৩১
● মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ রসূল করীম (সঃ)	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	৩২-৩৫
● হে মসীহে মাওউদ (আঃ)	ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আমীর হোসেন	৩৬
● আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)	ঃ মৌঃ এস এম আব্দুল হক	৩৭-৩৯
■ সংবাদ	ঃ	৪০

প্রচ্ছদ ঃ ১। মক্কার 'মসজিদুল হারাম' কা'বা ঘর

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় কোন প্রকার সাদৃশ্যপূর্ণ আশিস ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন আমরা সূরা নেসার ৭০ আয়াতের প্রতি তাকাই তখন আমরা আশান্বিত হতে পারি। কেননা, সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তাআলা ও এই মহানবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আনুগত্যের ফলে তাঁর উম্মতের মধ্যে আধ্যাত্মিক কল্যাণের ব্যাপকতা দান করা হয়েছে। সূরা কাওসারে তো তাঁকে (সঃ) বিপুল আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছে ! অথচ তাঁর শত্রুদের অপুত্রক বলে এ কল্যাণ যে দৈহিক বংশের প্রাপ্য নয় সে দিকেও অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং সূরা নিসার উল্লেখিত আয়াতে যে চারিটি আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা হলো সালেহ, শহীদ, সিদ্দীক ও নবী। বিগত বিগত ১৪শ' বছরে মুহাম্মদী উম্মতের (সত্যিকার আলে মুহাম্মদ) মধ্যে অসংখ্য সালেহ্ বান্দা (ওলী, গাউস কুতুব ইত্যাদি) এবং শহীদ ও সিদ্দীক হয়েছেন এ কথা কারও অস্বীকার করার জো নেই। আর তাঁরা সকলেই যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রসাদে ঐ পুরস্কার লাভ করেছেন তা-ও বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন বাকী থাকলো কমপক্ষে এমন একজন নবীর আগমনের ব্যাপারটি যিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্যে এ পুরস্কার লাভ করবেন; তবে তাঁর নতুন কোন শরীয়ত ও মুহাম্মদ (সঃ) থেকে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে না। এ ধরনের একজন নবীও সূরা জুমুআর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উম্মতে যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি হলেন আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালাম। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী-এর দাবী করেছেন। সুতরাং এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, গত প্রায় ১৪শ বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সহ উম্মতের লোকেরা যে দুরূদ শরীফ পড়ে আসছে তা বৃথা যায় নি আর যেতেও পারে না। নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে এ দুরূদ তাঁর জন্যে মহা আশিস ও মহা কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে অন্ততঃ আর কেউ এ কথা স্বীকার না করলেও আহমদীয়া মুসলিম জামাত মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করে।

- নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আহযাব

আয়াত 'খাতামান্ নবীঈন'

৪১। মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীদের মোহর;[২৩৫৯] এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৩৫৯। 'খাতাম' শব্দটি 'খাতামা' থেকে উৎপন্ন। 'খাতামা' অর্থঃ সে মোহর মারল, সে মোহরাঙ্কিত করল, বস্তুটির ছবি বা ছাপ মারল। এগুলি হলো 'খাতামা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ। এর গৌণ অর্থ হয় ঃ সে বিষয় বা বস্তুটির শেষ প্রান্তে পৌছলো, বস্তুটি ঢেকে দিল, লিখিত বস্তুকে সংরক্ষণের জন্য লিখার উপরে কাদা বা আঁঠা লেপে দিল বা মোহর মেরে রাখলো। 'খাতাম' মানে মোহর মারার আংটি; মোহর; অফিস-সীল বা ষ্ট্যাম্প, চিহ্ন দিবার যন্ত্র; শেষ প্রান্ত; কোন বস্তুর অন্তিমফল। 'খাতাম' শব্দ দ্বারা অলঙ্কার; সাজ-সজ্জা; সর্বতোভাবে পূর্ণ বুঝায়। খাতেম, খতম এবং খাতাম প্রায় সমার্থক (লেইন, মুফরাদাত, ফাত্হ এবং যুরকানী)। অতএব 'খাতামান্ নবীঈন'-এর অর্থ হবে ঃ নবীগণের মোহর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ নবী, নবীগণের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার। গৌণ অর্থে, নবীগণের শেষ অর্থাৎ নবুওয়তের ও শরীয়তের কামালিয়ত ও পূর্ণতার দিক দিয়ে সার্বিক উন্নতির দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী। তবে আরবী ব্যাকরণে 'খাতাম' শব্দটি যা 'ইসমে আলা'র (যন্ত্রবোধক বিশেষ্য) পদে ব্যবহৃত, যখন বহুবচনের দিকে 'মুযাআফ' হয়, তখন তা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে নবী করীম (সঃ) 'খাতামুল আওলিয়া' (তফসীর সাফী, আয়াত খাতামান্ নাবীঈন প্রসঙ্গে) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে 'খাতামুল মুহাজেরীন' বলেছেন (কান্‌যুল উম্মাল, ৬ পৃঃ)। মক্কায় থাকাবস্থায় যখন মহানবী (সঃ)-এর সকল পুত্রই শৈশবে মারা গেলেন তখন শত্রুরা তাঁকে 'আবতার' (অপুত্রক বা আটকুড়া) বলে বিদ্রূপ করতো এবং মনে করতো যে, তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ না থাকার কারণে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম শীঘ্রই হউক আর দেরীতেই হউক, নিঃশেষ হয়ে যাবে (মুহীত)। শত্রুদের এই বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে 'সূরা কাওসারে' অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) অপুত্রক নন, বরং তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক হয়ে যাবে। সূরা কাওসার অবতীর্ণ হবার পর প্রাথমিক মুসলমানদের মনে ধারণা জন্মায় যে, মহানবী (সঃ)-এর এমন পুত্র সন্তান জন্ম নিবে যারা দীর্ঘজীবী হবেন। আলোচ্য আয়াত এই ধারণাকে নাকচ করে ঘোষণা করলো যে, মহানবী (সঃ) কখনও যুবক-পুত্রের ('রিজাল' অর্থ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ) পিতা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। বাহ্যত যদিও মনে হয় যে, এই আয়াত ও সূরা কাওসারের বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত কথা রয়েছে, তথাপি এই আয়াতটি আসলে ঐ অনুমিত বৈপরীত্যের কারণে সৃষ্ট সংশয়কে দূরীভূত করেছে। এতে বলা হয়েছে, মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) হলেন 'রসূলুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র রসূল), যাতে এটাই বুঝায় যে, তিনি সারা উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। শুধু তাই নন, তিনি খাতামুন্নবীঈনও বটে অর্থাৎ তিনি সকল নবীগণেরও আধ্যাত্মিক পিতা। অতএব, তিনি যখন সকল মু'মিন ও সকল নবীর আধ্যাত্মিক পিতা, তখন তাঁকে কীভাবে 'আবতার' বলা যায় ? 'খাতামুন্নবীঈন' এর অর্থ যদি শেষ নবী করা হয়, যার পরে আর কখনও কোন নবী আসবেন না, তা হলে প্রসঙ্গের সাথে এর কোন সঙ্গতি থাকে না এবং খাপছাড়া হয়ে পড়ে। কেননা, অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ এটাই ছিল যে, মহানবী (সঃ) একজন 'আবতার' বা অপুত্রক লোক। খাতামুন্নবীঈনের অর্থ উপরোক্তভাবে করলে, তা এই বিদ্রূপের খন্ডন না হয়ে বরং এই বিদ্রূপের শক্তিশালী সমর্থন হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'খাতাম'-এর উপরোল্লিখিত অর্থগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে, 'খাতামান্নবীঈন'-এর চারিটি সম্ভাব্য অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যথা ঃ (১) হযরত নবী করীম (সঃ) নবীগণের মোহর অর্থাৎ মহানবী (সঃ)-এর সত্যায়নের মোহর ব্যতীত কোন নবীর সত্যতা সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রত্যেক নবীর নবুওয়ত মহানবী (সঃ)-এর সত্যায়ন ও সাক্ষ্য দ্বারা সত্য সাব্যস্ত হয় এবং মহানবী (সঃ)-এর পরে, তাঁর সত্যিকার অনুসারী ছাড়া কেউ নবুওয়ত লাভ করতে পারবে না, (২) নবী করীম (সঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মহীয়ান ও পূর্ণতম নবী, যিনি সকল নবীর গৌরব ও অলঙ্কারস্বরূপ (যুরকানী, শারাহ্ মাওয়হিব আল্-লাদুন্নিয়া), (৩) মহানবী (সঃ) ছিলেন শরীয়ত-বাহী নবীগণের শেষ। এই অর্থ করেছেন মুসলিম উম্মতের প্রখ্যাত বুযুর্গান, ওলামা এবং পণ্ডিতগণ, যথা ইবনে আরাবী, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্, ইমাম আলী ক্বারী, মুজাদ্দিদ আলফে সানী এবং আরও অনেকে। এই ইসলাম-বিশারদ, মহাজ্ঞানী বুযুর্গানে-দীন ও ওলী-আল্লাহ্‌গণের মতে, নবী করীম (সঃ)-এর পরে এমন কোন নবী আসবেন না, যিনি তাঁর মিল্লাত বা শরীয়তকে উঠিয়ে দেবেন অথবা তাঁর উম্মতের বাইরে থেকে হবেন (তাফহিমাত, মকতুবাত এবং ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির)। মহানবী (সঃ)-এর প্রতিভাময়ী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা তাঁকে (সঃ) 'খাতামান্ নাবীঈন' বল, কিন্তু এই কথা বলিও না যে, তাঁর পরে কোন নবী নাই" (মনসুর), (৪) মহানবী (সঃ) এই অর্থেই শেষ নবী ছিলেন যে, নবুওয়তের গুণাবলী ও সৌন্দর্য সার্বিকভাবে তাঁর মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আরবীতে সাধারণ ব্যবহারও, 'খাতাম' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের শেষ সীমা বুঝায়। এতদ্ব্যতীত, কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে, নবী করীম (সঃ)-এর পরেও উম্মতী নবী আসবেন (৪ঃ৭০; ৭ঃ৩৬)। মহানবী (সঃ) নিজের মনেও পরবর্তী কালে উম্মতী নবীর আগমন হবে বলে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। তিনি বলেছিলেন, ইব্‌রাহীম (মহানবী সঃ-এর পুত্র) যদি জীবিত থাকতো, তবে নিশ্চয়ই নবী হতো (মাজা কিতাবুল জানায়েয)। তিনি আরও বলেছিলেন,এই উম্মতে আবূবকর সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ, যদি কোন নবী হন তিনি ব্যতিরেকে" (কানযুল উম্মাল)।

হাদীস শরীফ

মুহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তম চরিত্র

১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সঃ) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদিগের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন (মুসনাদ দারিমী)।

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সঃ) কখনও কাউকেও প্রহার করেন নি- না কোন মহিলাকে না কোন খাদেমকে; যদিও তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যদি তিনি কখনও কারও দ্বারা কষ্ট পেতেন তবুও তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র বর্ণিত পবিত্র স্থানসমূহকে অপবিত্র করা হ'ত তখন তিনি আল্লাহ্‌তাআলার জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন (মুসলিম)।

৩। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সঃ) স্বয়ং নিজ হস্তে উটদিগকে খাবার খাওয়াতেন। ঘরের টুকি-টাকি কাজ করতেন। জুতো ঠিক করতেন। কাপড়ে রিপু করতেন, ছাগলের দুধ দোহাতেন। কাজের লোকদের সাথে আহার করতেন এবং গম ভাঙ্গানোর সময় কাজের লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন। বাজার হ'তে জিনিস-পত্র ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়াকে তিনি হেয় মনে করতেন না। ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে একইভাবে করমর্দন করতেন। সর্বপ্রথম সালাম করতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করতেন না যদিও সেই নিমন্ত্রণ শুধু মাত্র খেজুরের হ'ত। তিনি দুঃখীদের পরিত্রাণ দান করতেন। তিনি কোমল চরিত্রের (হৃদয়ের) অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহার উত্তম ছিল এবং তিনি প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তিনি হাসতেন কিন্তু উচ্চঃস্বরে নয়। তিনি কখনও বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করতেন না। তিনি বিনয়ী ছিলেন কিন্তু নীচমনা ছিলেন না, দানশীল ছিলেন কিন্তু অপচয়ী ছিলেন না, তিনি কখনও পেট পূরে খেতেন না পাছে আলস্য অনুভব করেন এবং কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে হস্ত প্রসারিত করেন নি (মিশকাত)।

৪। হযরত আবূ মূসা আল্ আশ্‌আরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাদিগকে একটি মোটা সুতার চাদর ও কয়েকটি বস্ত্র দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) এ বস্ত্রগুলি পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (বুখারী)।

সংগ্রহ ও অনুবাদ - **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

মকামে মুহাম্মদ (সঃ)

কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে উত্তম চরিত্র উল্লিখিত হয়েছে তা হযরত মূসা অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম, কারণ আল্লাহ্‌তাআলা ইরশাদ করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সেসব উত্তম চরিত্রগুণ একত্র হয়েছে যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন **ইন্নাকা লা'আলা খুলুকিন 'আযীম** অর্থাৎ তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর দন্ডায়মান আছ। আযীম শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয় তখন আরবী বাগধারায় উহা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালিয়ৎ (পূর্ণতা) বুঝায়। মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিক গুণ এবং মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব ঐসব চারিত্রিক গুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদী আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাঁর এ তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে, এর অধিক তারীফ সম্ভবই নয়। এর প্রতিই ইঙ্গিত করার জন্য অন্যত্র আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তোমার উপর আল্লাহ্‌র সর্বাধিক আশিস রয়েছে। কোন নবীর পক্ষে তোমার ন্যায় মর্যাদা অর্জন সম্ভব নয়। এ তা'রীফই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শান ও মুকাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ গীত সংহিতা (যবুর কিতাবে) ৪৫তম অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে- এই কারণে ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখীগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে (বারাহীনে আহমদীয়া)।

খোদাতাআলা তোমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনকে দু' অংশে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অংশ দুঃখ বিপদাবলীর ও ক্লেশের এবং দ্বিতীয় অংশ শক্তি ও বিজয় লাভের যেন বিপদের সময় সেই সব চরিত্র গুণ প্রকাশ পায় যা কেবল বিপদের সময়েই পেয়ে থাকে। এবং শক্তি ও বিজয় লাভের সময় সেই সব গুণ প্রকাশ পায় যা শক্তি ও বিজয় লাভ না করলে প্রকাশ পেতে পারে না। সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দু' প্রকারের যুগ ও অবস্থায় ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার ফলে উভয় প্রকারের চারিত্রিক গুণ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হ'ল। বিপদাবলীর যুগ যা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর তের বৎসর পর্যন্ত মক্কা মুয়ায্‌যমায় অতিবাহিত হ'ল সেই যুগের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এমন চারিত্রিক গুণ প্রদর্শন করলেন যা বিপদাবলীর সময় পরম সত্যবাদীকে প্রদর্শন করা উচিত। যেমন খোদার উপর ভরসা করা অধৈর্য ও অস্থির না হওয়া, দায়িত্ব পালনে শিথিল না হওয়া এবং কাউকেও ভয় না করা। কাফিররা এরূপ ইস্‌তেকামত (স্থিতিশীলতা) দেখে ঈমান আনল এবং সাক্ষ্য দিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি খোদার উপর পূর্ণ ভরসা না করবে এরূপ ইস্‌তেকামত প্রদর্শন এবং এত নির্যাতন বরণ করতে পারে না।

অতঃপর যখন দ্বিতীয় যুগ আসল, অর্থাৎ বিজয় ও ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদের যুগ, সে সময়েও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মার্জনা দানশীলতা এবং বীরত্বের মহান চারিত্রিক গুণ লক্ষ্য করে ঈমান আনল। ... বহু লোক তাঁর এ চারিত্রিক গুণ দেখে সাক্ষ্য দিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি খোদা কর্তৃক আদিষ্ট হয় এবং প্রকৃত সত্যবাদী হয় এরূপ চারিত্রিক গুণ কখনও প্রদর্শন করতে পারে না (ইসলামী নীতিদর্শন)।

আধ্যাত্মিক জীবন দানের ক্ষেত্রে কিয়ামত-সদৃশ নমুনা সকল গুণের অধিকারী সেই ব্যক্তি প্রদর্শন করেছেন যার মুবারক নাম মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, এ রসূল সে সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সকল জাতি দুনিয়াদারীতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল এবং আধ্যাত্মিক বিপর্যয় জলে ও স্থলে বসবাসকারীদিগকে বিনাশ করে ফেলেছিল। সে সময় এ রসূল এসে নতুনভাবে দুনিয়াকে জীবন দান করলেন এবং পৃথিবীতে তৌহীদের নদী প্রবাহিত করলেন।

ন্যায়-বিচারকগণ চিন্তা করুন যে, আরবের দ্বীপে বসবাসকারী লোক পূর্বে কী ছিল এবং এ রসূলের অনুকরণ করবার পর কী হয়েছে! তাদের পশুসদৃশ অবস্থা শ্রেষ্ঠ মানবের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। কেমন সভ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে তারা নিজেদের ঈমানকে সাচ্চা প্রমাণিত করেছেন। তাদের রক্ত প্রবাহিত করে, প্রাণ কুরবান করে, স্বজনগণকে পরিত্যাগ করে এবং তাদের ধন-সম্পদ মান-সম্মান ও আরাম-আয়েশকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত করে। বস্তুত দুনিয়াতে একজনই কামেল ইনসান আবির্ভূত হয়েছেন যিনি সর্বোত্তমভাবে এবং পূর্ণরূপে এক অপূর্ব রূহানী বিপ্লব সৃষ্টি ক'রে দেখিয়েছেন। যুগ-যুগান্তরের মৃতগণ এবং সহস্র সহস্র বছরের গলিত অস্থিসমূহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তার আগমনে সমাধিসমূহ উন্মুক্ত হ'ল এবং পচা হাড়সমূহ নব জীবন লাভ করল এবং তিনি প্রতীয়মান করে দেখালেন যে, তিনিই 'হাশির' -সমবেতকারী এবং তিনিই রূহানী কিয়ামত। এক জগৎ কবরসমূহ হতে উঠে তাঁর কদমের উপর দাঁড়াল (আইনায়ে কামালতে ইসলাম)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এ-ও যে, হযরতে মামদূহ্‌র (অর্থাৎ নবী করীম-সঃ) চিরস্থায়ী কল্যাণ সদা সর্বদা জারী রয়েছে। এ যুগেও যে ব্যক্তি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামে অনুসরণ করে তাকে নিঃসন্দেহে কবর হতে উত্থিত করা হয় এবং তাকে এক নতুন রূহানী জীবন দান করা হয় (আইনায়ে কামালতে ইসলাম)।

সংকলন ও অনুবাদ- আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

আল্লাহ্‌তাআলার 'আযীয' সিফতের আরো ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২২ মার্চ, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার-এর ২৯নং আয়াত পাঠ করে খুতবা এরশাদ করেন।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

অর্থাৎ ... প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই ভয় করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী অতি ক্ষমাশীল (সূরাতুল ফাতির ঃ ২৯)।

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'একজন সাধারণ ইবাদতকারী বান্দার তুলনা একজন জ্ঞানবান বা আলেম ইবাদতকারীর প্রাধান্য এমনই যেমন তোমাদের উচ্চমর্যাদাবান ব্যক্তি নিম্নতম ব্যক্তির তুলনায় বড় মর্যাদাবান'। তারপর হুযূর (সঃ) এই আয়াত পাঠ করেন। তারপর তিনি (সঃ) বলেন, 'যারা তোমাদের মধ্যে অন্য সকলকে নেকী ও খায়ের (মঙ্গল ও কল্যাণ)-এর শিক্ষা দেন তাদের উপর আল্লাহ্‌তাআলা, ফিরিশ্‌তাগণ, যারা আকাশ ও ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং সমুদ্রের মাছেরাও দুরূদ পাঠ করে এবং দোয়া করে তাদের জন্য।'

এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্রের মৎস্য জগৎও দুরূদ প্রেরণ করে। এটি একটি বাচনভঙ্গী, অর্থ এই সৃষ্টির সব কিছু তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে শান্তি কামনা করে। বাহ্যিক অর্থে নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত **ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা** এর প্রকৃত অর্থ এই যে, মূলতঃ যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন তাঁরাই আলেম। এখানে আল্লাহ্‌র ভয়কে প্রথমে রাখ হয়েছে আর ইল্‌মকে পরে। অর্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে আলেম সে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না তারা 'আলেম' নয়।

হযরত কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মদীনা থেকে এক ব্যক্তি হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর নিকট এসেছিলেন। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই! তোমাকে কি কারণে আমার কাছে আসতে হয়েছে? ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি একটি হাদীস সম্পর্কে জানতে এসেছি এখানে। আমি শুনেছি যে, আপনি ঐ হাদীস আঁ হযরত (সঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি নিজের কাজে তো আস নি? ঐ ব্যক্তি বললেন, না। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে তো আস নি? ঐ ব্যক্তি বললেন, না। আমি কেবল ঐ হাদীসটি আপনার থেকে শুনতে এসেছি। তারপর হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বললেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তায় চলতে থাকে, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশের পথে পরিচালিত করবেন। ফিরিশ্‌তাগণ ঐ ব্যক্তির উপর নিজেদের ডানা মেলে ধরেন। আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই আলেমদের জন্য ইস্তিগফার করে (ক্ষমা চায়)।

ফিরিশ্‌তাগণের ডানা বলতে তাদের সিফাত বা গুণাবলী বুঝায়। নতুবা বাহ্যিকভাবে ডানার অর্থ হবে না। ফিরিশ্‌তারা ডানা মেলে ধরেন অর্থ-তারা তাদের গুণাবলী দিয়ে ঐ ব্যক্তির চলার পথে তার উপর প্রভাব ফেলে। সবাই ইস্তিগফার করেন। সাধারণ ইবাদতকারী বান্দার তুলনায় আলেমের মর্যাদা এ রকম যেমন অন্য নক্ষত্ররাজির তুলনায় চাঁদের মর্যাদা। **উলামায়ে কিরাম আম্বীয়া আলায়হিমুস্‌সালাম হন। আম্বিয়া কেরামের পরিত্যক্ত সম্পদ দিনার বা দেরহাম (টাকা বা মুদ্রা) হয় না। বরং তাঁদের সম্পদ আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ইলম) হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ সম্পদ হাসিল করে সে অনেক বড় সম্পদ লাভ করে।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্‌জাল্লা শা'নুহুকে তারা ভয় পান যারা আল্লাহ্‌র আযমত (উচ্চ মর্যাদা) কুদরত (মহাশক্তি) ও অতি মাত্রায় পবিত্র গুণাবলী, সৌন্দর্য, অনিন্দ্য সুন্দর সত্তা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন।' **আল্লাহ্-ভীতি ও ইসলাম প্রকৃতপক্ষে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক থেকে একই জিনিস। আল্লাহ্-ভীতি ইসলামের মূল উপাদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।** অতএব আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এটাই যে, ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহিমা ও তাঁর পবিত্র সিফাত বা গুণাবলী।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, "রব্বানী আলেম" (আল্লাহ্‌র ওলী শ্রেণীর আলেম) বলতে এমন আলেমকে বুঝায় না, যে কেবল আরবী গ্রামার এবং যুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী হয়। বরং রব্বানী আলেম বলতে এমন আলেমকে বুঝায় যিনি সর্বদা আল্লাহ্‌তাআলার ভয়ে ভীত থাকেন এবং কখনও তার মুখ দিয়ে বেহুদা কথা বের হয় না। বর্তমান যুগ এমন যে, সামান্য মানুষও নিজদেরকে আলেম বলে পরিচয় দেয়। এবং এই শতাব্দীকে তারা নিজেদের জন্য ব্যবহার করেছে। এভাবে এই শব্দটির বড় অবমূল্যায়ন হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে এই শব্দটির অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ 'আলেম' শব্দের মূল অর্থ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ **ইন্নামাইয়াখ্‌শাল্লাহা মিন ইবদিহিল উলামা** অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলাকে যারা ভয় করেন তারাই আল্লাহ্‌র বান্দা এবং উলামা। দেখার বিষয় এই যে, যাদের মধ্যে এই গুণ আল্লাহ্-ভীতি এবং তাকওয়াহ্ থাকে না তারা কোন অবস্থাতেই এই সম্মানিত উপাধিতে আখ্যায়িত হবার উপযুক্ত নয়। আসলে 'উলামা' আলেম শব্দের বহুবচন। ইলম (জ্ঞান) যিনি অর্জন করেছেন। আর 'ইলম' এমন জ্ঞানকে বলা হয় যা সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত জ্ঞান। প্রকৃত সত্য জ্ঞান তো কুরআন শরীফ থেকে লাভ হয়। সত্য জ্ঞান না তো অতীতের গ্রীক দর্শন থেকে লাভ করা সম্ভব আর বর্তমানের ইংল্যান্ডের দর্শন থেকে লাভ করা সম্ভব। বরং খাঁটি জ্ঞান খাঁটি ঈমানের দর্শন থেকে লাভ করা সম্ভব। একজন মু'মিনের পূর্ণতা ও সাফল্য এই যে, সে যেন আলেমের মর্যাদা লাভ করে। হাক্‌কুল ইয়াকীন অর্থাৎ পরিপাক ও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে। এটাই ইলম্ এর সর্বোচ্চ স্থান। কিন্তু যে ব্যক্তি হাকীকী বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে

নি এবং মা'রেফত (ঐশী তত্ত্বজ্ঞান) ও প্রকৃত দর্শনের দরজা তার জন্য খোলে নি সে নিজকে 'আলেম' পরিচয় দিলেও আসলে সে ইলমের গুণাবলী লাভ করে নি। এবং প্রকৃত নূর বা আলো তার মধ্যে পাওয়া যায় না। সে সম্পূর্ণভাবে লোকসানের মধ্যে বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আছে। এরা নিজেদের পরকাল ধোঁয়া ও অন্ধকার দিয়ে ভরে নিয়েছে। যাদেরকে প্রকৃত সত্য জ্ঞান ও মা'রেফত ও (বসিরত) ঐশী দর্পণ প্রদান করা হয় এবং এলম্ (জ্ঞান) যার প্রাপ্তি **খাশিয়াতুল্লাহ্** (আল্লাহ্-ভীতি) প্রদান করা হয় এরা এমন যাদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে বনী ইসরাঈলের নবীদের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"স্মরণ রাখ, পদস্খলন হামেশা অজ্ঞ বা অজ্ঞানদেরই ঘটে থাকে। শয়তানের পদস্খলন যে ঘটেছিল তা তার জ্ঞানের কারণে নয় বরং তার অজ্ঞতার কারণে। যদি সে পরিপক্ক বা সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখত তবে তার পদস্খলন ঘটত না। কুরআন শরীফে ইলম্-এর কুৎসা করা হয় নি বরং আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রশংসা করা হয়েছে। "অর্ধেক মোল্লা ঈমানের জন্য ভয়ংকরী" বলা হয়ে থাকে, "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"। আমার বিরোধীরা জ্ঞানের কারণে ধ্বংস হয় নি বরং মূর্খতার কারণে ধ্বংস হয়েছে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, 'উলামা' শব্দ দেখে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। আলেম সে, যে আল্লাহ্কে ভয় করেন। **ইন্নামা ইয়াখ্শাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা**। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্কে ভয় করেন তারাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে আলেম। তাদের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্য ও আল্লাহ্-ভীতি এতটা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তারা আল্লাহ্র থেকে জ্ঞান ও গুড়-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করেন। এবং তাঁর থেকে কল্যাণ লাভ করেন। এই মর্যাদা আঁ হযরত (সঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর (সঃ) ভালবাসার মধ্যে ডুবে লাভ করা যায়। আঁ হযরত (সঃ)-এর রং এ রঙ্গীন হয়ে যেতে হয়।"

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑩
أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ
فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑪
جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ⑫

অর্থ ঃ তোমার মহা পরাক্রমশালী ও পরম দানশীল প্রভু-প্রতিপালকের কৃপার ভান্ডারগুলো কি তাদের নিকট আছে?

অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর আধিপত্য কি তাদের কব্জায় আছে? যদি তাই হয় তাহলে তারা যেন তাদের রশিসমূহের সাহায্যে ওপরে আরোহণ করে। (তারা) বিভিন্ন দল্ সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী, যারা সেখানে পরাভূত হবে (সূরাতুস্ সাদ; ১০-১২)।

এ আয়াতসমূহ সূরা আহযাবের যুদ্ধের পূর্বে আয়াত। এখানে যুদ্ধের পূর্বেই শুভ সংবাদ বর্ণিত হয়েছে যে, এই যুদ্ধে শত্রুরা ধ্বংস হবে।

হযরত আওফা বিন আব্দুল কালায়ি বর্ণনা করেছেন, একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরা কোন্টি? আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, **কুল হুআল্লাহু আহাদ**, ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত আয়াত কোন্টি? আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, 'আয়াতুল কুরসী'। তারপর ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করেছে, হে আল্লাহ্র নবী ঐ আয়াত কোন্টি যার বিষয় আপনি চান যে আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে আল্লাহ্র দরবারে গৃহিত হোক।' আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, সূরা বাকারার শেষাংশ। কারণ এটি আল্লাহ্র রহমতের ভান্ডারের একটি। আল্লাহ্তাআলা এটিকে আমার উম্মতের জন্য প্রদান করেছেন। পৃথিবীতে কোন মঙ্গল নেই যা এখানে শামিল হয় নি।"

এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র আরশের নীচ থেকে প্রদান করা হয়েছে (সূরাতুল বাকারার শেষাংশ)। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্র সিফাতের বিকাশ হয়েছে।

এখানে তিনটি সূরার [এক সূরা ও এক সূরার দু'টি পৃথক পৃথক অংশ] পৃথক পৃথক অংশ উল্লেখ করেছেন। অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছেন তার অবস্থাকে সামনে রেখে হুযূর (সঃ) উত্তর দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তির জন্য সবচে' প্রয়োজন সূরা **কুলহু আল্লাহু আহাদ** এর তারপর অন্যান্য অংশ।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী **আম ইনদাহুম খাযায়েনো রহমাতি রব্বিকা**-কে উল্লেখ করে বলেছেন, 'আযীয' সিফত এখানে রেখে বলা হয়েছে যে, নবুওয়তের মর্যাদা অত্যন্ত মহান মর্যাদা। এই মর্যাদা তিনিই কেবল প্রদান করতে পারেন যিনি 'আযীয' হন। অর্থাৎ সকল শক্তির অধিকারী এবং ওওহাব অর্থ বড় দানশীল। এমন সত্তা কেবল মাত্র আল্লাহ্রই পবিত্র সত্তা। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান ও পরম দানশীল ও দাতা।

رَبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ ⑥⑦

অনুবাদ ঃ তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর প্রভু-প্রতিপালক, মহাপরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল (সূরাতুস্ সাদ ৬৭)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) রাতে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী প্রভু-প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি আকাশসমূহ পৃথিবী ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সবাইকে কায়েম রেখেছো। তোমারই জন্য প্রকৃত প্রশংসা তুমি আকাশ ও পৃথিবীর নূর। তোমার কথাই সত্য, তোমার অঙ্গীকারই সত্য। তোমার সাথে অবশ্যই সকলকে সাক্ষাৎ করতে হবে। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। হে আল্লাহ্! তোমার আনুগত্য স্বীকার করছি, তোমার উপর ঈমান রাখি, তোমার উপর ভরসা করি, তোমার দিকে ঝুঁকে আছি; তোমার দেয়া শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি, কেবল তোমার কাছেই করুণা ভিক্ষা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর ঐ সব কর্মের জন্য, যা ভবিষ্যতের জন্য করেছি, অতীতের করে এসেছি, যা আমি প্রকাশ করেছি আর যা প্রকাশ করি নি। তুমিই একমাত্র আমার মা'বূদ, তুমি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বূদ নেই। পৃথিবী এবং আকাশ সম্পর্কে মানুষের জানা ছিল। কিন্তু এ দু' এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিছু আছে একথা ঐ যুগে কারো জানা ছিল না। কুরআন শরীফের এটি একটি মু'জিযা, কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই দু' এর মধ্যেও অনেক কিছু সৃষ্টি রয়েছে। আমাদের উপরে আকাশ ও শূন্যস্থান দেখা যাচ্ছে। আসলে এটা শূন্যস্থান নয়। এর মধ্যে বহু কিছু আছে। অনেক রশ্মি ইত্যাদি শক্তি রয়েছে। মানুষ চিন্তা করতে পারে না।

تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

অনুবাদ ঃ এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্র নিকট হতে নাযেল হয়েছে। (সূরাতুয্ যুমার ঃ ২)

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কালাম কুরআন শরীফের মর্যাদা অন্য সমস্ত কিতাবের তুলনায় এমনই উজ্জ্বলতর যেমন আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির তুলনায় অনেক উর্ধ্বে।" হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! তোমরা শোন, নিশ্চয় বড় ফেৎনা দেখা দিবে।" আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তখন আমরা কী করব? কীভাবে রক্ষা পাব? আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, "আল্লাহ্র পবিত্র কিতাব। এর মধ্যে তোমাদের পূর্ববর্তীদের

ঘটনাবলী এবং ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের পরস্পরের মধ্যকার বিষয়াদির মীমাংসাও আছে। একটি বড় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যা এই কিতাবে রয়েছে। এখানে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই। কোন বড় অত্যাচারী ব্যক্তিও যদি এর বিপরীত করে তবে আল্লাহ্ তার কোমর ভেঙ্গে দিবেন। আর যদি কেউ এ ছাড়া অন্য কোথাও হেফাযত পেতে চায় আল্লাহ্ তাকে বিপথগামী বলে গণ্য করবেন। এই কিতাবই আল্লাহ্‌র শক্তি রজ্জু এবং এটিই আল্লাহ্‌র যিক্‌র, এটিই সিরাতে মুস্তাকীম (সোজাপথ)। এটিই এমন কিতাব যার ফলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বিকৃত হয় না আর না বক্তব্যের মধ্যে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকে। উলামায়ে কেরামের অন্তর কখনও এ কিতাব পড়া থেকে আগ্রহ হারায় না। বারবার পড়াতেই কখনও বিরক্তি সৃষ্টি হয় না। এর চমক কখনও শেষ হবার নয়। এটি এমন কিতাব যা শুনতেই জিন্নরা বলেছিলেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝٢
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا
أَحَدًا ۝٣

"নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি যা নিশ্চয় হেদায়াতের দিকে নিয়ে যায়, সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি।" যে ব্যক্তি কুরআনকে ভিত্তি করে কথা বলেছে সে সত্যকথা বলেছে। যে এর নির্দেশনা মতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সে পুরস্কৃত হয়েছে। যে এর আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সে সততা ও ন্যায়ের উপর থেকে সিদ্ধান্ত করেছে। যে ব্যক্তি এর প্রতি আহ্বান করেছে সে সিরাতে মুস্তাকিমের প্রতি আহ্বান করেছে (সূরাতুল জিন্ন ঃ ২,৩)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, "মানুষ সাধারণতঃ মর্যাদাবান ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বড় সম্মান দেয়। আল্লাহ্ বলছেন, এই কিতাব পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র কিতাব।"

"আল্লাহ্‌র সমস্ত কালাম (বাণীই) সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়ে থাকে। যদ্বারা তাঁর নিজের তাঁর রসূলগণের এবং মু'মিনদের ইয্যত ও বুযূর্গী প্রকাশ পায়। **লিল্লাহিল ইয্যাতো ও লিরসূলিহি ওয়ালিল মু'মিনীনা** (৬৩:৯) তিনি রসূলগণকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। প্রকৃত উচ্চতা ও ভালবাসা কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। মু'মিনদের জন্য আবশ্যক সে যেন প্রত্যেক কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র ইয্যতের খেয়াল রাখে কারণ তিনি 'আল্ আযীয'।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন,

"আরবের বুকে মক্কায় আঁ হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাব নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ইয্যত ও হামদ্ এর স্পষ্ট নিদর্শন। যে সময় আঁ হযরত (সঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তখন আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের যে সম্পর্ক হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। হাজার হাজার সমস্যা কেবল এই অজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সুসম্পর্ক কায়েম করে দেয়া এবং এর উপর কায়েম রাখা আরো কঠিন বিষয় ছিল। নবীগণের কিতাব ও ঐশী কিতাবসমূহের আসল ধর্ম-বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে ভুল ধারণা ধর্ম-বিশ্বাসের স্থান দখল করে রেখেছিল। তারপর ওসব ভুল ধারণা যা ধর্ম-বিশ্বাসের স্থান দখল রেখেছিল তার বিপরীত কিছু করার ক্ষমতা কারোই ছিল না। পৃথিবীর লোভ-লালসা চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। বড় বড় নেতৃস্থানীয়রা নিজ নিজ মর্যাদাকে এমনভাবে ধরে রেখেছিল যে, তাদের জন্য উক্ত স্থান থেকে সরে আসা অসম্ভব ছিল। এ তো আল্লাহ্‌র বড় খাস ফযল ছিল যে, আরবে আঁ হযরত আবির্ভূত হয়ে বিরাট পরিবর্তন সাধন করলেন। **ইয়াতলু আলায়হিম আয়াতিহি** ... (সূরাতুল জুমুআ ঃ ৩)। প্রথমতঃ হুযূর (সঃ) আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে পড়ে মানুষকে শোনালেন। তারপর **ইয়াক্কিহিম** তাদের পাক-পবিত্র করে দিলেন। কারণ কেবল আয়াত পড়াতে কোন লাভ হ'ত না। আঁ হযরত (সঃ)-এর এটি একটি অত্যন্ত অসাধারণ যোগ্যতা যে, তিনি আয়াত পড়ে পড়েই মানুষ পাক পবিত্র করতে পেরেছিলেন, অন্য কোন নবীর বেলায় এমনটা ঘটে নি যে, আয়াত পড়েই মানুষকে পবিত্র করেছেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর কুওওতে কুদসীয়ার (পবিত্রকরণ) ক্ষমতা কত শক্তিশালী ছিল যে, এত অল্প সময়ে এত বেশী মানুষের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। আরবের ইতিহাসে যারা পড়েছেন তারা জানেন যে, আঁ হযরত (সঃ) এসে ঐ জাতিকে সম্পূর্ণ নতুন জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তাদের চরিত্র তাদের আচরণ ও তাদের ঈমানের মধ্যে এমন পরিবর্তন সাধন করেছিলেন যা পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। যে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বিবেচনা করবে তার বুঝতে কষ্ট হবে না যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর কুওওয়াতে কুদসীয়া (পবিত্রকরণ ক্ষমতা) অন্য নবীগণের তুলনায় কত বেশি ছিল। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রয়োজন কত বেশি ছিল।"

(আমি পড়তে গিয়ে দ্রুত গতিতে পড়তে আরম্ভ করে দিই- অনুবাদকদের প্রতি আল্লাহ্ ফযল করুন)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কুরআন শরীফের সৌন্দর্য ও গুণাবলী সম্পর্কে যে সমস্ত আরবী কবিতা রচনা রয়েছেন, তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ "কুরআন তার নূর দ্বারা মানব জাতিকে আলোকিত করে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা অন্ধ! তোমাদেরকে আমি কীভাবে দৃষ্টিশক্তি দিতে পারি?"

এতো বড় মর্যাদাবান গ্রন্থ! যা সমস্ত বরকতের সমষ্টি। আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্যের শরবত পান করিয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণে ঐ শরবত পান করায়। এর সৌন্দর্য ও রূপ কতই না চমৎকার! আমি তো একে মতি, কস্তুরী ও আম্বরীর মত সুন্দরতম দেখছি। এই কিতাব সম্মানিত কিতাব। এর আয়াত বড় চিরস্থায়ী সত্যসম্বলিত। এই কিতাব মানুষের অন্তর ও মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র এই কিতাব মা'রেফতে-এর সমুদ্র (ঐশী-তত্ত্ব)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আন্তরিকতার সাথে আমাদের দৃষ্টিতে প্রকৃত মু'মিন সে, যে কুরআনের আনুগত্য ও অনুসরণ করে এবং একে "খাতামুল কুতুব" জ্ঞান করে। আঁ হযরত যে শরীয়ত আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাকে চিরস্থায়ী বলে বিশ্বাস করে। এর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন করে না। নিজের মন প্রাণ দিয়ে এর অনুকরণ ও অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয়। নিজের দেহ-মন-প্রাণের প্রতিটি কোষকে এ পথে নিয়োজিত করে। জেনে বা শুনে এর বিপরীত কাজ করে-এর বিপরীত কথা বলে না।"

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى
النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ
الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ ۝٦

অর্থ ঃ তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা ঢেকে দেন ও রাতকে দিন দ্বারা ঢেকে দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন, এদের প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধাবমান রয়েছে। শুন! তিনি মহাপরাক্রমশালী অতি ক্ষমাশীল (সূরাতুয্ যুমার ঃ ৬)।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, "আল্লাহ্ যে সমস্ত জিনিস আকাশসমূহে সৃষ্টি করেছেন (চন্দ্র-সূর্য গ্রহ নক্ষত্র) এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তিনি যেমন 'আযীয' মহাপরাক্রমশালী তেমনই তিনি 'গাফ্‌ফার' (অতি ক্ষমাশীল) ও। অর্থাৎ তিনি বড় রহমত, অনুগ্রহ ও করুণাময়।"

'আযীয' সিফত দ্বারা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তিনি যখন মহাপরাক্রমশালী তখন নিশ্চয় বড় ভয়েরও কারণ। তাই এখানে আযীয-এর সাথে 'গফ্ফার' সিফতকে যোগ করে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, না তিনি পরাক্রমশালী হলেও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের আশা করা যায়।"

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করো। আর তুমি যাকে সেদিন মন্দ থেকে রক্ষা করবে তার প্রতি নিশ্চয় তুমি দয়া করবে। এবং এটা প্রকৃতপক্ষে মহাসফলতা (সূরাতুল মু'মিন ঃ ৯)।

"আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে আমরা বেরিয়েছিলাম, আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "সেই আল্লাহ্‌র কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সততার সাথে ঈমানানুযায়ী আমল করবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। আমি আশা করি অন্যান্য মু'মিনদের জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তোমরাও তোমাদের পরিবারবর্গ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমার খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের ৭০ হাজার মানুষকে বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।"

এখানে ৭০ হাজার অর্থ ৭০ হাজার নয় বরং বহুগুণ বেশি। আমি আশা করি ৭ লক্ষেরও বেশি উম্মতি বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন আমি নামায পড়ছিলাম। হুযূর (সঃ) বললেন, 'হে উম্মি আব্দ-এর ছেলে! তুমি চাও, যা চাও তাই দেয়া হবে'। হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) দ্রুত সেখানে আসলেন। হযরত উমর বললেন, আপনি (আবূ বকর) যখনই আমার চেয়ে বেশি পুণ্য লাভ করতে চেয়েছেন তখনই আপনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হতে পেরেছেন। তারপর উভয়ে মিলে আমাকে দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার একটি দোয়া আছে যা আমি বার বার পড়ি। "হে আল্লাহ্! আমি তোমার থেকে এমন জান্নাত চাই যা কখনও বিলুপ্ত হবে না। চোখের এমন শীতলতা চাই যা কখনও শেষ হবে না। আর আমি জান্নাতে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে অবস্থান লাভের প্রত্যাশা করি।

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۖ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝

অর্থ ঃ 'হে আমার জাতি! কেমন আশ্চর্য কথা! আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকছো।

তোমরা আমাকে এজন্যে ডাকছো যেন আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিও তাকে তাঁর শরীক করি যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই, আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মহাপরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল (আল্লাহ্‌র) দিকে (সূরাতুল মু'মিন ঃ ৪২-৪৩)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, দান-খয়রাত করলে কারো সম্পদ কমে না। যে ব্যক্তি অপরকে ক্ষমা করে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সম্মান দান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে ...।"

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী উপরন্তু আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে 'আযীয' সিফত সম্পর্কে লিখেছেন, 'আযীয' শব্দের মধ্যে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একথাও রয়েছে যে, সর্বশক্তিমান না হলে তিনি মা'বূদ (উপাস্য)ও হ'তে পারেন না। ফেরাউন তো অত্যন্ত দুর্বল ব্যক্তি ছিল। সে তো কোন অবস্থাতেই মা'বূদ হবার যোগ্য ছিল না। অন্যান্য প্রতিমাগুলো তো কেবল মূর্তি মাত্র এরা মা'বূদ হতে পারে না।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদ ঃ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌তাআলা ঐভাবেই তোমার প্রতি ওহী নাযেল করছেন যেভাবে তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি (নাযেল) করেছিলেন (সূরাতুশ্ শূরা ঃ ৪)।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

অনুবাদ ঃ যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছেন? তারা তখন অবশ্যই বলবে, এগুলোকে মহা পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন (সূরাতুয্ যুখরুফ ঃ ১০)।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তারা সবাই মুশরিক ছিল না। অনেকেই আল্লাহ্ তথা স্রষ্টার উপর ঈমান রাখত এবং জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ্‌র কথা স্পষ্ট স্বীকার করত।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদ ঃ এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাঁরই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরাতুল জাসিয়া ঃ ৩৮)॥

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, সকল উচ্চতা ও মহিমা আমার উপরের চাদর এবং ইয্যাত আমার বিছানা। যে কেউ এর মধ্যে আমার অংশীদার হবার চেষ্টা করবে তাকে আমি জাহান্নামে ফেলে দেব।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

অর্থ ঃ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহ্‌রই; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরাতুল ফাতাহ্ ঃ ৫)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, মুনাফিক পুরুষ ও নারীকে, মুশরিক পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে ...।

আল্লাহ্ এদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন, এদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করেছেন যা খুবই খারাপ আবাসস্থল। এরা যেন নিজেদের জনবল, ধন-দৌলত ও শক্তির কারণে উন্মত্ত না হয়। এবং তাদের বর্তমান অবস্থার কারণে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে না করে। অহংকারী না হয়। এদেরকে শাস্তি দেয়া, ধ্বংস করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন নয়। কোন কিছুর জন্য উপকরণ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা আমাদের কাজ। আকাশ ও পৃথিবী সবই আমাদের মুঠোর মধ্যে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাবান। আমরা তোমাকে হে নবী! শাহেদ মুবাশ্বের ও নাযির [নেগরান, শুভসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী] করে পাঠিয়েছি। অবশ্যই তোমরা আমাদের রসূলের প্রতি ঈমান আনবে। তাঁকে সাহায্য সমর্থন দিবে এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র তসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ করবে।"

অবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ কতিপয় ইলহামও পড়ে শোনাচ্ছি।

"ওয়া ইয্যাতি ওয়া জালানী ইন্নাকা আনতাল আ'লা"

অনুবাদ ঃ আমার সম্মান ও শক্তির কসম! নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী"। হযরত (আঃ) এখানে লিখেছেন, "এখানে আমাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।"

ওয়ালা তা'জাবু ওয়ালা তাহ্যানু ওয়া আনতুমুল আলাওনা ইন কনতুম মু'মিনীনে। ওয়া বেইয্যাতি ওয়ালা জালালী ইন্নাকা আন্তাল আ'লা। মুমায্যিকুল আদাআ কুল্লা মুমায্যাকীন। ওয়া মাকরো উলায়িকা হুয়াইয়াবুর। অর্থ ঃ "আশ্চর্য হইবে না (কি করে সম্ভব! এমন ভাববে না)। মনে কষ্ট নিবে না। তুমি অবশ্যই বিজয়ী হবে যদি (তোমরা ঈমানের উপর দৃঢ়তার সাথে কায়েম ও স্থির থাক। আমি আমার ইয্যত ও জালালের (সম্মান ও প্রতাপ) কসম খেয়ে বলছি তুমিই বিজয়ী হবে। আমরা শত্রুদের কুচি কুচি করে ফেলব। তাদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে।"

২১ আগষ্ট ১৮৯৭ইং সনের একটি ইলহাম ঃ "ইন্নি মায়া আল্লাহিল আযীযিল আকবর।" অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ যিনি আযীয ও আকবর (সবচেয়ে বড়) তার সাথে আছি। "আন্তা মিন্নি ওয়া আনা মিন্কা" অর্থ ঃ তুমি আমা হতে আর আমি তোমা হতে।"

এর অর্থ খুব সহজ, "আমি তোমার ও তুমি আমার"।

২০ নভেম্বর ১৮৯৮ইং ঃ সম্ভবতঃ গত সোমবার দিবাগত রাত ছিল- রাত প্রায় ৩-০০টার সময় ইলহাম হয়েছে, [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান (রাঃ)-কে এক পত্র মাধ্যমে লিখেছেন] "ফাবেআইয়ে আযীযিন বা'দাহু তা'আলামুন" অর্থ ঃ আল্লাহ্ আযীয হযরত (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'এত বড় দুর্ঘটনার চেয়ে বড় আর কি ঘটনা ঘটবে যদ্বারা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে? ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ তারিখের ইলহাম ঃ "এক ইয্যাত কা খেতাব, এক ইয্যাত কা খেতাব। লাকা খেতাবুল ইয্যাহ্ এক বড় নিশান উসকে সাথ হোগা' অর্থ ঃ একটি সম্মানের সম্বোধন বা পদবী, একটি সম্মানের পদবী, তোমার জন্য সম্মানের পদবী, একটি বড় নিদর্শনও এর সাথে থাকবে।" এই ইলহাম সম্পর্কে হযরত (আঃ) লিখেছেন,

"আমাকে বিশেষ সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে আমার নবী উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আমার সম্মানের পদবী প্রদান করেছেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "আজ রাতে (১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার, ১৮৯৯)। দেখলাম, বৃষ্টি হচ্ছে, আস্তে আস্তে বৃষ্টি পড়ছে। আমি সম্ভবতঃ স্বপ্নের মধ্যে বললাম, 'আমরা তো এখনই দোয়া করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু বৃষ্টি তো হয়েই গেল।" আমি জানি না যে, শীঘ্রই বৃষ্টি হবে। অথবা উপরে বর্ণিত ইলহাম, "ইয্যাত কা খেতাব...সাথে একটি বড় নিদর্শন, অনুযায়ী আমাদের জামাতের উপর সমর্থন ও বিজয়ের বৃষ্টি হবে। অথবা উভয় প্রকার বৃষ্টিও হয়ে যেতে পারে। আমাদের স্বপ্ন অবশ্যই সত্য এবং অবশ্যই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। উভয় বিষয়ের মধ্যে কোন একটি তো অবশ্যই হবে। হয়ত আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য রহমতের দরজা খুলবে এবং বৃষ্টি হবে। অথবা কোন বড় অসাধারণ নিদর্শন আধ্যাত্মিক বিজয় ও সাহায্যের নিদর্শন প্রকাশ পাবে।"

১০ অক্টোবর, ১৯৮৮ইং এর একটি ইলহামের উল্লেখ করে হযরত আকদস (আঃ) লিখেছেন, "স্বপ্নে আমাকে একটি বালককে দেখানো হয়েছে যার নাম আযীয, তার পিতার নামের মধ্যে 'সুলতান,' শব্দটি রয়েছে। ঐ বালককে ধরে আমার কাছে এসে বসানো হয়েছে।" আমি দেখলাম, সে একটি হালকা-পাতলা ফর্সা রং এর বালক। আমি এ স্বপ্নের তা'বীর করেছি এই যে, আযীয ইয্যাত বা সম্মানী ব্যক্তিকে বলা হয়। 'সুলতান' শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় এমন দলিল প্রমাণকে বলা হয় যা খুবই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। সুলতান কেবল এমন দলিলকে বলা হয় যা উজ্জ্বল তা-ও গ্রহণযোগ্যতার শক্তি বলে হৃদয়কে দখল করে ফেলে। এবং সৎ স্বভাব ও পুণ্যবান প্রকৃতির মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে জয় করে ফেলে। অতএব স্বপ্নে যে বালককে দেখেছি, যার নাম আযীয এবং সে সুলতানের পুত্র এর অর্থ এই যে, এমন নিদর্শন প্রকাশিত হবে যা মানুষের হৃদয়কে জয় করবে। এমন নিদর্শন প্রকাশের ফলাফল যা ভিন্ন কথায় নিদর্শনের পুত্রস্বরূপ। মানুষের হৃদয়ের উপর আমার আযীয (প্রাধান্য বিস্তারকারী) হওয়ার অর্থও তা-ই যা স্বপ্নে আযীয নামক ব্যক্তির আকারে আমাকে দেখানো হয়েছে।"

উপরোক্ত স্বপ্ন যে সম্বন্ধে ইলহামও ছিল, অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ ও পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের অনেক পরে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর যুগে হযরত মির্যা সুলতান আহমদ (রাঃ) বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র মির্যা আযীয আহমদ (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে বয়াত করেছিলেন। হযরত মির্যা আযীয আহমদ (রাঃ)-এর বয়াতের পরে যখন তাঁর বড় চাচীর নিকট বললেন, আমি বয়াত করেছি, বড় চাচী হাসতে হাসতে বললেন, তোর উপর বেতের আঘাত হয়েছে! মির্যা আযীয আহমদ বলেছিলেন, সবাইকে এই বেতের আঘাত হবে। (অর্থাৎ সবাই বয়াত করবেন) সুতরাং ইয্যতের খেতাব (পদবী) বাহ্যিক অর্থেও পুরা হয়েছে। উপরে বর্ণিত ইলহাম, "ইয্যাত কা খেতাব, ইয্যাত কা খেতাব, লাকা খেতাবুল ইয্যাহ্" তারপর স্বপ্নে আযীয নামের বালক যার পিতা সুলতান দেখানো হয়েছিল পুরোটাই বাহ্যিকভাবে এবং আক্ষরিকভাবেও পূর্ণতা পেয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে।

এবার ১৯০০ইং এর একটি ইলহাম,

" একই ইয্যাত কা খেতাব, এক ইয্যাত কা খেতাব, লাকা খেতাবুল ইয্যাতে। এক বড় নিশান উসকে সায় হোগা। ..." অনুবাদ ঃ একটি ইয্যাত ও সম্মানের পদবী বা একটি সম্মানজনক পদবী, তোমার জন্য মর্যাদাপূর্ণ পদবী বা সম্বোধন। তার সাথে একটি নিদর্শন প্রদর্শিত হবে। খোদা ইচ্ছা করেছেন যে, তোমার নামকে সম্মানের সাথে প্রসিদ্ধি, খ্যাতি ও বিস্তার প্রদান করবেন। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তোমার নামের খুব উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করবেন। আমি আমার শক্তির উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করবো। এবং শক্তি প্রদর্শনপূর্বক তোমাকে উচ্চতা প্রদান করব। আকাশ থেকে কতিপয় সিংহাসন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তোমার সিংহাসনটি সর্বোচ্চ স্থানে সংস্থাপন করা হয়েছে। শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হবার সময় ফিরিশ্তাগণ তোমার সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্র তোমার সকল কর্মকান্ডকে সাফল্য দান করবেন এবং তোমার সকল ইচ্ছা পূরণ করবেন। রব্বুল আফ্ওয়াজ্ অর্থাৎ সেনাবাহিনীর প্রভু-প্রতিপালক এদিকে দৃষ্টি দিবেন।

যদি হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর দিকে দেখা যায় তবে দেখা যাবে যে, তাঁর তুলনায় এখানে বরকত ও কল্যাণ কোন অংশেই কম নেই। "আমাকে আগুনের ভয় দেখাবে না। আগুন তো আমাদের অনুগত দাস বরং আমার দাসদেরও দাস।"

উপরোক্ত ইলহাম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'ইয্যাতের খেতাব'-এর অর্থ মনে হচ্ছে এই হবে যে, অধিকাংশ মানুষ আমাকে চিনে ফেলবে এবং (ইয্যাত কা খেতাব) সম্মানের সাথে সম্বোধন করবে। একটি খাস নিদর্শন প্রকাশের পরে এমন হবে।

পড়তে পড়তে অনেক সময় দ্রুত পড়তে শুরু করি। আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক অনুবাদকদেরকে সাফল্য দান করুন।

অনুবাদ - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদকে মুহাম্মদ থেকে তোমরা কীরূপে পৃথক ভাবো?
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রসূল-প্রেম
মূল ঃ মোকাররম সিদ্দীক আশরাফ আলী, কাদিয়ান

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালামের রসূলে মকবুল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তার সাথে এমন গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিলো এবং এমন প্রেম ও ভালবাসা ছিলো যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এক ফারসী কবিতায় নিজে বলেছেন -

বা'দ আয খোদা বে ইশ্‌কে মুহাম্মদ মুখাম্মরম গার কুফরঈঁ বাওয়াদ বাখোদা সখত কাফেরম॥

অর্থাৎ হে লোক সকল! আমি খোদাতাআলার প্রেমের পরে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রেমে বিভোর। যদি কেউ এ কারণে আমাকে কাফির বলে যে, আমি ঐ পবিত্র নবীর একজন প্রেমিক তাহলে খোদার কসম আমি সবচে' বড় কাফির।

যখনই মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর প্রেমের উল্লেখ করা হবে এবং যখনই ঐ পবিত্র নবীর আলোচনা হবে তখন লোকেরা রসূলের এ একনিষ্ঠ প্রেমিকের কথা বলতে বাধ্য হবেন। তিনি লিখে গেছেন, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর সাথে কীরূপ ভালবাসা পোষণ করতে হয়। তিনি শিখিয়ে গেছেন, যে পথগুলো প্রেমাস্পদের দেশের দিকে চলে গেছে সেই পথগুলো কী কী। তিনি শিখিয়ে গেছেন যে, নবী করীম (সঃ)-এর কী কী উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। তাঁর (সঃ) জীবনের যেসব দিক দুনিয়ার নিকট প্রচ্ছন্ন ছিলো, তা তিনি শিখিয়ে গেছেন আর তিনি বাত্‌লিয়ে দিয়ে গেছেন ঐ সত্তা কোন্ কোন্ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন এবং বিশ্বের প্রতি তাঁর কী কী অনুগ্রহ ছিলো। আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর কতটুকু প্রেমের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও তাঁর এ প্রকৃত প্রেমিককে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই সনাক্ত করেছিলেন এবং তার আবির্ভাবের চিহ্নসমূহও বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। আর তিনি উম্মতকে বলে দিয়েছিলেন যে, যিনি আমার প্রিয় ও যাকে আমি ভালবাসি তিনি শীঘ্রই আবির্ভূত হবেন। তাঁর উম্মতকে বাত্‌লিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি আমি মুহাম্মদ (সঃ) হই তাহলে তিনি আহমদ (আঃ)। যদি আমি সূর্য হই তাহলে তিনি চন্দ্র। যদি আমি প্রথমে হই তাহলে তিনি শেষে। আমি হাদী ও পথ-প্রদর্শক হলে তিনি মাহ্‌দী ও পথ-প্রাপ্ত। আমি মূসা হলে তিনি ঈসা। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের মধ্যে কেবল এ সত্যিকারের প্রেমিক ব্যতিরেকে আর কাউকে বিশেষভাবে 'সালাম' প্রদান করেন নি। তিনি বলেছেন, যদি বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তাহলে সেখানে পৌঁছাও এবং আমার সালাম পৌঁছাও। অনুরূপভাবেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ও প্রেম প্রকাশ করার জন্যে বলেছেন, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী আমার সাথে আমার কবরে সমাহিত হবেন আর কেয়ামতের দিন আমরা উভয়েই একই কবর থেকে উঠে দন্ডায়মান হবো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ কথাকে তাঁর কবিতার মধ্যে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা না বুঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে পৃথক করতে চায় অথচ তাঁরা উভয়েই একই ও একই সত্তা। তিনি (রাঃ) বলেন -

সাগরেদ নে জো পায়া উসতাদ কি দওলাত হ্যায়।

আহমদ কো মুহাম্মদ সে তুম কেয়সে জুদা সামঝে॥

অর্থাৎ শীষ্য যা পেয়েছেন তা গুরুর ভান্ডার থেকেই।

আহমদকে মুহাম্মদ (সঃ) থেকে তোমরা কীরূপে পৃথক ভাবো।

তাঁর (সঃ) সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যে প্রেম ছিলো এবং যে ভালবাসা ছিলো তা তার জীবনের প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রত্যেক নড়াচড়ায় পরিপুষ্ট হতো। এ উচ্চ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে তার সারাটা জীবন উৎসর্গীত ছিলো। তার লেখাগুলোর মধ্যে, হোক না তা কবিতায় বা গদ্যে, উর্দুতে লেখা হোক বা ফার্সীতে অথবা আরবী ভাষায়, ঐ সকল লেখার প্রতিটি শব্দে শব্দে বরং প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে রসূল (সঃ)-এর প্রেমের ঝর্ণা ধারা পরিলক্ষিত হয়। তিনি মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্তিত্বের সামনে নিজের সত্তাকে একেবারেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। একস্থানে তিনি বলেছেন,

- উস নূর পর ফিদা হুঁ উসকা কি ম্যায় হুয়া হুঁ

উওহ হ্যায় ম্যাঁ চিজ কেয়া হুঁ বাস ফয়সালা য়্যাহি হ্যায়॥

অর্থ ঃ ঐ জ্যোতিতে আমি বিলীন, আমি তাঁরই হয়ে গেছি।

তিনিই আছেন, আমি কি বস্তু অর্থাৎ কিছুই না আর আসল মীমাংসা ইহাই।

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে যে উচ্চ ও উন্নত স্থান দান করেছিলেন তা কেবল ঐ পবিত্র নবী (সঃ)-এর ভালবাসা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের কল্যাণে দান করেছিলেন। তিনি লেখেন ঃ

"তিনি আমাকেও কথোপকথনের সম্মান দান করেছেন। কিন্তু এ সম্মান আমার কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণে লাভ হয়েছে। যদি আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মত না হতাম এবং তাঁর (সঃ) অনুসরণ না করতাম যদি দুনিয়ার পাহাড়গুলোর সম পরিমাণ আমার পুণ্যকর্ম হতো তাহলেও কখনও এ কথোপকথনের সম্মান অবশ্যই পেতাম না" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া ঃ ১২-১৩ পৃষ্ঠা)।

তিনি পুনরায় বলেন-

"আমি তাঁর অনুসরণের ও তাঁর প্রতি ভালবাসার কারণে ঐশী নিদর্শনাবলীকে নিজের ওপরে অবতীর্ণ হতে এবং অন্তর দৃঢ়-বিশ্বাসের জ্যোতিতে পূর্ণ হতে দেখেছি। আর এত অলৌকিক নিদর্শন দেখেছি যে, এসব সুস্পষ্ট জ্যোতিসমূহের মাধ্যমে আমি খোদাকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছি" (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা-৫)।

তিনি আরও বলেন -

"সুতরাং আমি কেবল খোদার অনুগ্রহে, নিজের কোন পুণ্যের দ্বারা নয়, পরিপূর্ণ অংশ

লাভ করেছি যা আমার পূর্বের নবী ও রসূলগণ এবং খোদার মনোনীত বান্দাগণকে দেয়া হয়েছিলো। আর আমার এসব কল্যাণ লাভ করার সম্ভাবনা ছিলো না। যদি আমি আমার নেতা ও প্রভু নবীদের গর্ব শ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথের অনুসরণ না করতাম। সুতরাং আমি যা লাভ করেছি তাঁর অনুসরণে লাভ করেছি। আমি সত্যিকারের ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত যে, কোন মানুষ ঐ নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতিরেকে খোদার সন্নিধানে পৌছুতে পারে না" (হাকীকাতুল ওহী, ৬২ পৃষ্ঠা)।

তিনি এ বিষয়-বস্তুকে তাঁর একটি কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেছেন-

হাম হুয়ে খায়রে উমাম তুস সে হি আয়ে খায়রে রসূল

তেরে বাড়হ্বনে সে কদম আগে বাড়হায়া হামনে ॥

অর্থ ঃ আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি তা তো তোমার মাধ্যমে হে শ্রেষ্ঠ রসূল!

তোমার সম্মুখে আগাবার কারণে আমাদের পদ আগে বেড়েছে॥

তার ভালবাসা কেবল হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং আলে মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার উদ্দীপনাময় প্রেম ছিলো। [হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কন্যা] হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রাঃ) বলেন যে, একবার মহররমের দিনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের সমবয়সী শিশুদের নিকট কারবালার ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। শাহাদতের বর্ণনা করতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। তিনি আঙ্গুল দ্বারা চোখের পানি মুছতে ছিলেন এবং বলতে ছিলেন যে, আল্লাহ্তাআলা ইয়াযীদের ওপরে অভিসম্পাত বর্ষণ করুন! সে আমাদের প্রিয় নবীর দৌহীত্রকে শহীদ করেছে। এথেকে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, পবিত্র নবীর জন্যে তার কত ভালাবাসা ছিলো যে, চৌদ্দশ' বছর পূর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মরণ তার অন্তরকে কতটা বিচলিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত করে দিতো।

দুই জগতের সর্দার সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে তার এ পবিত্র ভালবাসার ফলে ইসলামের কোন শত্রু, বিশেষ করে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রদানকারী কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলাও তিনি পসন্দ করতেন না বরং তার সালাম গ্রহণ করাকেও তিনি পসন্দ করতেন না। এক সময়ের ঘটনা আছে যে, তিনি রেলওয়ে স্টেশনে কোন গাড়ীর অপেক্ষায় সাহাবা কেরামসহ অবস্থান করছিলেন। এ সময়ে তার ঘোরতর দুশমন পণ্ডিত লেখরাম এদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। আর্য সমাজীদের এ নেতা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খুবই গালি-গালায করতো। সে থেমে গিয়ে হযরত আকদস (আঃ)-কে সালাম করে। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। সে এই ধারণায় যে, হয়ত তিনি শুনেন নি তাই পুনরায় সালাম দিলো। কিন্তু তিনি এবারও চুপ থাকলেন। এরপর সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ হুযূর (আঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, লেখরাম আপনাকে সালাম দিচ্ছে। তিনি বড়ই প্রতাপের সাথে বল্লেন, আমার প্রভুকে গালি দেয় আর আমাকে সালাম করে?!

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার ওপরে খৃষ্টান ও আর্য সমাজীদের অপবিত্র লিখিত আক্রমণে তাঁর (আঃ) অন্তরে খুবই ব্যথা লাগতো আর তিনি খুবই বিচলিত হতেন। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন একাজ থেকে বিরত থাকে।

নিম্নোক্ত লেখাটি পড়লে বুঝা যাবে যে, তিনি কতখানি কষ্ট পেতেন। তিনি বলেন-

"খোদার কসম! যদি আমার সন্তানাদি এবং তাদের সন্তানাদির সন্তানাদি, আমার সকল বন্ধু-বান্ধব, আমার সকল সহায়তাকারী ও সাহায্যকারীকে আমার চোখের সম্মুখে হত্যা করা হয়, স্বয়ং আমার হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং আমার চোখের মণি উপড়িয়ে ফেলা হয় আর আমাকে আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং আমার সকল আনন্দ ও সকল আরাম-আয়েশ আমি হারিয়ে বসি তাহলে এ সকল কথার মোকাবেলায় আমার জন্যে এ দুঃখ অধিক ভারী যে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে এরূপ অপবিত্র আক্রমণ করা হয়" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, আরবী অংশের অনুবাদ)।

অনুরূপভাবে অন্য একস্থানে বলেন-

"আমি সত্য সত্যই বলছি যে, আমরা বিষাক্ত সাপদের ও মরুভূমির ভেড়াদের সাথে সন্ধি করতে পারি কিন্তু ঐসব লোকদের সাথে সন্ধি করতে পারি না যারা আমাদের প্রিয় নবী- যিনি আমাদের প্রাণ ও পিতা-মাতার চেয়েও অধিক প্রিয় তার ওপরে আক্রমণ করে। খোদা আমাদের ইসলামের ওপরে মৃত্যু দিন। আমরা এমন কাজ চাই না যদ্বারা আমাদের ঈমান বিনষ্ট হতে থাকে" (পয়গামে সুলহে, পৃষ্ঠা ৩০)।

তার নিজের লোক তো দূরের কথা অন্য লোকেরাও একথা বিশেষভাবে অবহিত ছিলো যে, রসূল-প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের মোকাবেলা করতে পারে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নি। সুতরাং মুসলমানদের বড় নেতা স্যার ফযল হুসায়েন সাহেব যার সঙ্গী হিসেবে হযরত চৌধুরী জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব (রাঃ) এবং ডঃ ইকবাল প্রমুখ কাজ করতেন। তাকে কেউ বল্লেন, আপনি তো জাফর উল্লাহ্ খানকে বুকে তুলে নিয়েছেন। তিনি তো এমন একটি জামাতের সদস্য যে, যারা রসূলের অবমাননা করে (নাউযুবিল্লাহ্)। এতে স্যার ফযল হুসায়েন সাহেব সত্বর উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভিতর থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের উর্দূ কবিতার বই 'দুররে সামীন' নিয়ে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, মির্যা সাহেবের ওপরে আপনারা যা ইচ্ছে অপবাদ লাগাতে পারেন কিন্তু এ কবিতা পাঠ করার পরে আমি তো ইহা বলতে পারি যে, তার মত রসূল প্রেমিক আমার চোখে পড়ে নি।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, একবার তিনি সারা রাত রসূলে করীম (সঃ)-এর ওপরে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে কাটিয়ে দিলেন এবং তার প্রাণ ও মন দুরূদ শরীফের কল্যাণে সুরভিত হয়ে গেল। ঐ রাত্রেই তিনি কাশ্ফ বা দিব্য-দর্শনে দেখলেন যে, আল্লাহ্তাআলার ফিরিশ্তারা আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন এবং তার বাড়ীর চারিদিকে জ্যোতিঃ ও মেশ্ক (মৃগনাভী) পরিপূর্ণ মশকসমূহ নিষ্কাশিত

হচ্ছে। সমগ্র পরিবেশ সুগন্ধ ও জ্যোতিতে সুরভিত হয়ে গেছে। খোদাতাআলার ফিরিশ্‌তারা বলেন, দুরূদের আকারে যে উপহার মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছিলেন উহার প্রতিদানে খোদাতাআলা এ উপহার প্রেরণ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে খোদাতাআলা ইসলাম ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হিসেবে আবির্ভূত করেছেন।

তিনি বলেন,

"একবার আমার নিকট ইলহাম হলো যার অর্থ ছিলো এই যে, মালায়ে 'আলা (উচ্চ স্বর্গলোক)-এর লোকেরা বিবাদে লিপ্ত আছে। অর্থাৎ ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্যে ঐশী কামনায় আবেগে ভরপুর। কিন্তু দূরবর্তী মালায়ে 'আলায় অবস্থানরত সঞ্জীবিতকারী ব্যক্তি নিয়োজিত হওয়া প্রকাশিত হয় নি তাই তারা বিতর্কে লিপ্ত। ইতোমধ্যে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, লোকেরা একজন সঞ্জীবিতকারীর অন্বেষণে ব্যস্ত আর এক ব্যক্তি ও অধমের নিকটে আসলো এবং ইঙ্গিতে সে বল্লো, হাযা রাজুলুঁইহিব্বু রসূলুল্লাহ্ অর্থাৎ এই সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রসূলকে ভালবাসেন এবং এ কথার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, ঐ পদের জন্যে মহান শর্ত ছিলো রসূল-প্রেম। সুতরাং উহা এই ব্যক্তির মধ্যে সত্যতায় পর্যবসিত (বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫-৬)।

আহমদ (আঃ)-এর মর্যাদা অনুমান ও ধারণার থেকেও অধিক।

যাঁর গোলাম হিসেবে দেখো যুগের মসীহ্ (আঃ)-কে॥

তাঁর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি দেখলাম যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম মসজিদে মুবারকে একাকী ছিলেন এবং আস্তে আস্তে পায়চারী করছিলেন ও হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ)-এর এ কবিতা পড়ে যাচ্ছিলেন এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো -

কুনতাস্ সাওয়াদা লিনাযিরী ফাআমিয়া আলায়কান্ নাযিরু।

মান শায়া বা'দাকা ফাইয়ামূত ফা আলায়কা কুনতো উহাযিরু॥

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি তো আমার চোখের মণি ছিলে। তোমার মৃত্যু আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। এখন তোমার পরে দুনিয়াতে কেউ মারা যাক বা বেঁচে থাক তাতে আমার কি যায় আসে। তোমার মৃত্যুতেই আমি ভীত ছিলাম।

এ সাহাবী (রাঃ) হযরত আকদস (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত কাঁদছেন কেন? তিনি বল্লেন, এ কবিতাটি আমার খুবই আদরের। হায়! যদি এ কবিতা আমি রচনা করতাম। আল্লাহ্! আল্লাহ্! রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তিনি কতই না ভালবাসতেন।

তিনি চাইতেন যে, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় উচ্চারিত যে কোন উত্তম ও প্রিয় কথা তার মুখ থেকেই যেন বের হয়। অথচ রসূল-প্রেমে কোন গদ্য হোক বা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে হযরত আকদস (সঃ)-এর মোকাবেলাকারী পূর্বেও জন্মগ্রহণ করে নি আর ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম রচিত আরবী কবিতায় বলেন -

জিসমি ইয়াতিরু ইলায়কা মিন শাওকিন 'আলা ইয়া লায়তা কানাত কুওওয়াতুত্তায়রানী-

অর্থাৎ হে আমার প্রিয় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! আমার আত্মাতো তোমার ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে তোমার পদযুগলে কবেই উৎসর্গীত হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার দেহের উড়বার শক্তি লাভ হতো তাহলে আমি উড়ে গিয়ে তোমার নিকটে এসে যেতাম। একদিকে সর্দারে দু'আলম (দুই জগতের নেতা) সারওয়ারে কায়েনাৎ (সৃষ্টির সেরা) হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যাঁর মহান চরিত্র এবং সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের কোন দৃষ্টান্ত নেই আর অন্য দিকে তাঁর (সঃ) প্রেমিক এবং তাঁকে সবচে' অধিক ভালবাসেন যিনি তার পবিত্র সত্তা হলো মসীহে মাওউদ (আঃ)। সুতরাং তার রসূল-প্রেম তো এমন একটি সমুদ্র যার মধ্যে যতবারই কেউ ডুব দিবে সে ততবারই অসংখ্য মণিমুক্তা দ্বারা সৌভাগ্যমন্ডিত হবে। তাঁর রসূল-প্রেমের কখনও নিঃশেষ হবে না। তিনি (আঃ) কতই না সুন্দর বলেছেন -

ইন্নী আমুতু ওয়ালা তামুতু মুহাব্বাতি
ইউরী বি যিক্‌রিকা ফিত্তুরাবি নিদাঈ

অর্থাৎ আমি তো মরে যাবো কিন্তু হে আমার প্রিয় মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কখনও মরবে না। এবং কখনও নিঃশেষ হবে না। বরং উহা সদা জীবিত থাকবে। এমন কি যে, আমার কবর থেকে তোমার স্মরণের ধ্বনি উত্থিত হবে এবং আমার কবর তোমার স্মরণে পরিচিতি লাভ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্বীয় জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন-

"আমি ভাল করে জানি যে, আমাদের জামাত এবং আমরা যা-ই হই না কেন ঐ অবস্থায়ই আল্লাহ্‌তাআলার সমর্থন ও সাহায্য আমাদের সাথী হবে যদি আমরা সিরাতে মুস্তাকীম ও সরল-সুদৃঢ় পথে পদচারণা করি, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যথার্থ ও সত্যিকারের অনুসরণ করি, কুরআন শরীফের পবিত্র শিক্ষাকে নিজেদের কর্ম-পদ্ধতি করি, এসব কথাকে আমরা আমাদের কাজে ও অবস্থায় প্রমাণিত করি; কেবল কথায় যেন না করি। যদি আমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখো যে, যদি সারা জগৎ একত্র হয়েও আমাদের বিনাশ করতে চায় তাহলেও (আমরা) বিনাশ হবো না। এজন্যে যে, খোদাতাআলা আমাদের সাথী হবেন (আল্ হাকাম, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা-৪)

অতএব মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের জামাতের অন্তর্ভুক্ত আমরা যারা আহমদী মুসলমান তাদের অবশ্য কর্তব্য এই যে, এ ভালবাসাকে যা কিনা তিনি আমাদের প্রাণে উজ্জীবিত করেছেন যেন মরতে না দিই। ইহাকে যেন কেবল জীবিতই না রাখি বরং জীবন প্রদায়িনী বানিয়ে নিই এবং হযরত রসূলে মকবুল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে ব্যক্তিগত প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি করি। এ মহান অনুগ্রহকারীর সাথে যেন স্বয়ং নিজেরাও ভালবাসার সম্পর্ক রাখি এবং সন্তানদের অন্তরেও যেন তাঁর (সঃ) ভালবাসা সৃষ্টি করি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের এই সৌভাগ্য দান করুন, আমীন। (১৫-৪-৯৭ তারিখের ইন্টারন্যাশনাল আল ফযলের সৌজন্যে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

রসূল (সঃ)-প্রেম ও তার মাহাত্ম্য

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১২ নভেম্বর, ১৯৯৯ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরাতুল-মায়িদাহ্-এর ৩৬তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ ঃ 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের ওসীলা (উপায় বা মাধ্যম) অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' নৈকট্য লাভের ওসীলা অন্বেষণ কর কথাটির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ওসীলাস্বরূপ গ্রহণের জন্য মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপায় খোদাতাআলার নৈকট্য লাভের ওসীলা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি ঃ

হযরত আবূযর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'সর্বোৎকৃষ্ট পুণ্য হচ্ছে খোদার জন্য (কাউকে) ভালবাসা এবং খোদার জন্যই ঘৃণা করা' (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ্)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'আল্লাহ্কে ভালবাস, এ জন্য যে তিনি বিভিন্ন রকমের অসংখ্য নেয়ামতের দ্বারা তোমাদেরকে রিযিক যোগান এবং আমাকে তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার দরুন ভালবাস এবং আমার আহ্লে বায়তকে আমার প্রতি ভালবাসার কারণে ভালবাস' (তিরমিযী, কিতাবুল মানাক্বিব)।

উবাদাহ্ বিন সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক (সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে ভালবাসে আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎকে ভালবাসেন এবং যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে অপসন্দ করে, আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন না' (তিরমিযী, কিতাবুল্ জানায়িয)। এর দ্বারা কেবল আখেরাতের সাক্ষাৎকে বুঝায় না। বরং দুনিয়াতেও সাক্ষাৎ আছে। যারা ইহকালে আল্লাহ্কে পাশ কাটায় এবং তাঁর যিক্র (স্মরণ) করতে অস্থিরতা বোধ করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ওরূপ সম্পর্কহীন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করা হবে। অতএব এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এ শুধু কিয়ামতকালের বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ওরূপ হবে। বরং এ দুনিয়াতেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করে এবং তাঁকে পসন্দ করে সে ব্যক্তিই কিয়ামতকালেও আল্লাহ্তাআলার প্রিয় হবে।

হযরত কাতাদাহ্ বিন নো'মান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহ্ কাউকে ভালবাসেন তখন তাকে তিনি পার্থিবতা থেকে সেরূপে রক্ষা করেন যেরূপে তোমাদের মধ্যে কেউ (কোন) রুগীকে পানি থেকে রক্ষা করে।' এর দ্বারা এহ বুঝায় যে,

কোন কোন রোগ এতো কঠিন হয়ে থাকে যে, ঐ সব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর পানি ঢালা তার জন্য মারাত্মক হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ দুনিয়াদারী (পার্থিবতা) থেকে রক্ষা করেন যেমন কিনা তোমরা ওরূপ কোন রোগীকে পানি থেকে রক্ষা করে থাক।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'পরীক্ষা যত বড় হবে প্রতিদানও তত বেশি দেয়া হবে, এবং আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি। আর যে অপসন্দ করে তার জন্য রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি' (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতান)। উল্লিখিত বিষয়গুলো এরূপ সুস্পষ্ট যে, এগুলোর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, "কিয়ামত কবে হবে?' তিনি বললেন, 'তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?' সে বললো, 'কিছুই না। তবে আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সঃ)-কে ভালবাসি।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তুমি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালবেসেছ' (বুখারী, কিতাবুল মানক্বিব)।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি এবং নবী করীম (সঃ) মসজিদ থেকে বেরুচ্ছিলাম। তখন মসজিদের দোরগোড়ায় এক ব্যক্তিকে আমরা পেলাম। সে বললো, 'হে আল্লাহ্র রসূল! কিয়ামত কবে আসবে?' নবী করীম (সঃ) বললেন, 'তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?' অর্থাৎ কিয়ামত সম্পকে তো জিজ্ঞেস করছো কিন্তু এর জন্য কি কিছু প্রস্তুতিও নিয়েছ? সে ব্যক্তি তাতে হতভম্ব হয়ে পড়লো। তারপর সে বললো, 'এর জন্য আমি অনেকগুলো রোযারও আয়োজন করি নি, আর অনেক নামায এবং সদকারও আয়োজন করি নি। কিন্তু একটি ব্যাপার অবশ্য আছে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসি।' তিনি (সঃ) বললেন, 'তুমি তার সাথে থাকবে যাকে তুমি ভালবাস' (বুখারী, কিতাবুল আহ্কাম)। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্ঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং বললো, 'হে আল্লাহ্র রসূল! সে-ব্যক্তির সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ সে তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'মানুষ তারই সাথে (গণ্য) হয়ে থাকে যাকে সে ভালবাসে' (বুখারী, কিতাবুল আদাব)। এখন, এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে স্মরণ রাখা উচিত, কেননা তিনি আঁ

হযরত (সঃ)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি বলেন, **'হিস্‌মী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শওকিন আলা / ইয়া লাইতা কানাত কুওয়াতুত্ তাইয়ারানি'**- 'আমার দেহ (সত্তা) তো এক প্রবল আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার সাথে তোমার দিকে উড়ে চলেছে। হায়! আমার মধ্যে যদি (তদনুযায়ী) উড়ার শক্তি-সামর্থ্য হতো।' অতএব 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ সে তাদের সাথে মিলিত হয় নি' এ হাদীসটি হুযূর আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপর প্রযোজ্য হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কেবল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কেই ভালবাসতেন না, বরং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কওম বা সম্প্রদায়কেও ভালবাসতেন। সুতরাং তাঁর অসংখ্য লেখায় তিনি সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অসামান্য গুণ-কীর্তন করেছেন।

অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, মানুষ তার সাথেই (গণ্য) হয়ে থাকে যাকে সে ভালবাসে। আহমদীয়া জামাতের উচিত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে মিলিত হলে আপনারা সাহাবার সাথে মিলিত হবেন। যদি সাহাবাকে ভালবাসেন এবং তাঁদের সাথে মিলিত হবার আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনাদের থাকে, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন ঃ "সাহাবা সে মিলা জাব্ মুঝকো পায়া।" (যখন আমাকে সে পেল তখন সে সাহাবার সাথে মিলিত হল)। অতএব, যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে পেয়ে যান তাহলে সেই সঙ্গে সাহাবাকেও পেতে পারেন এবং সাহাবাকে পেতে পারেন না যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে লাভ করেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি তার এক লিল্লাহী ভাই (অর্থাৎ যাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসতো) অন্য এক গ্রামে যেখানে সে বাস করতো, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরুলো। আল্লাহ্‌তাআলা তার যাত্রাপথে এক ফিরিশ্‌তাকে নিযুক্ত করলেন। যখন সে ব্যক্তি ঐ ফিরিশ্‌তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন সে (ফিরিশ্‌তা) জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ'? সে উত্তর দিল, "আমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি! আত্মীয়তার কারণে?' সে জবাব দিল, 'না'। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কি তার কোন উপকার বা সদ্ব্যবহারের দরুন সৌজন্যের কারণে?' সে বললো, 'না'। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী সে কারণ যে জন্য তার কাছে যাচ্ছো?' সে ব্যক্তি বললো, 'একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আমি তাকে ভালবাসি কেবল এ জন্যই তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

অতএব, বিপুল সংখ্যক আগন্তুক যারা জলসার সময় এখানে (কেন্দ্রে) উপস্থিত হন- এই অধমের মধ্যে তো কোন কিছু নেই প্রকৃত সত্য এটাই, কিন্তু তারা অবশ্যই আমাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসেন; অতএব তাদের জন্য মুবারক হোক যে, তখন ঐ ফিরিশ্‌তা বললো, 'শুনো। আমি তোমার নিকট আল্লাহ্‌র এই শুভবার্তা নিয়ে এসেছি যে, খোদাতাআলা ও তোমাকে ভালবাসেন, এজন্য যে তুমি ঐ ব্যক্তিকে খোদার খাতিরে ভালবাস' (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্‌উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্যে সবচে' নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, তাদের মধ্যে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী দুরূদ প্রেরণকারী হবে" (তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, মা জায়া ফি ফাযলে সালাতিন আলান নবীয়ে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)। **অতএব দুরূদের উপর অনেক জোর দেয়া উচিত। রাত-দিন (মুখে-অন্তরে)** দুরূদ-এর বির্‌দ থাকা উচিত। অন্যান্য কথা-বার্তা চলতে থাকাকালেও জিহ্বাতে দুরূদের আবৃত্তিই অব্যাহত থাকা উচিত।

এই দুরূদের প্রসঙ্গে আমার স্মরণ পড়ে গেল, কিছু লোক আছে যারা এমনিতে দুরূদ পড়ে কিন্তু কথা-বার্তার সময় তারা নোংরা কথা বলে। সেজন্য তাদের দুরূদ পড়া নিষ্ফলই হয়। দুরূদের উপকার তারই হবে যে তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দুরূদ প্রেরণ করে এবং খেয়াল যদি সরেও যায় কোন কারণে, তবুও জিহ্বা অবলীলায় দুরূদ আবৃত্তি করতে থাকে, এমতাবস্থায় যে, হৃদয়ের অনুগমনে দুরূদ পাঠায়।

হযরত আবূ তাল্‌হা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত রসূল করীম (ঃ) ভোর বেলায় অত্যন্ত আনন্দোজ্জ্বল ছিলেন। আনন্দের প্রভা তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত ছিল। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আজ আপনি অত্যন্ত আনন্দিত, আনন্দের আভাস আপনার মুখমন্ডল থেকে প্রস্ফুটিত দেখাচ্ছে।' বললেন, "আজ আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আগন্তুক আসলো, সে বললো, তোমার উম্মতের যে ব্যক্তিই তোমার প্রতি দুরূদ পাঠাবে, আল্লাহ্ তার জন্য দশটি পুণ্য লিখে দিবেন এবং দশটা পাপ মোচন করে দিবেন এবং দশটি দর্জা বা মর্যাদায় তাকে উন্নীত করবেন। ঐ দুরূদের (গুণগত বৈশিষ্ট্যের) অনুপাতে তার দিকে সওয়াব প্রত্যার্পণ করা হবে" (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)। এখন, এই যে 'দুরূদের অনুপাতে' শেষ বাক্যটি রয়েছে তা দশ সংখ্যাটিকে অসীম ও অসংখ্য বলে প্রতিপন্ন করেছে। কেননা, দুরূদের আনুপাতিক বৈশিষ্ট্য যদি অধিক হয় তাহেলে কেবল দশটি পুণ্যের প্রশ্ন নয় বরং গণনাতীত পুণ্য তার স্বপক্ষে লিখা হবে। এবং কেবল দশটি গোনাহ্ ঝরে যাবার কথা নয় বরং গোনাহ্ ঝরে যাবার পর তাকে পুণ্যে ভূষিত করার ধারা শুরু হয়ে যাবে। অতএব হাদীসটিতে যে শেষ ব্যাকাটি রয়েছে তদনুযায়ী এই দুরূদের আনুপাতিক বৈশিষ্ট্যের দিকে সওয়াব প্রত্যার্পিত হবে। এটা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দুরূদের প্রতিদানকে সীমাহীন করে দেখায়।

এখন পরিশেষে আমি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি ও উপদেশ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আজ যেহেতু জুমুআর নামাযের পর কয়েকটি বিবাহও পড়ান হবে সেজন্য আমি অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপাকারে বিষয়াবলীর আয়োজন করেছি। কেননা, বিবাহ পড়াতে এতো সময় লেগে যাবে যতটা সাধারণত: জুমুআতে লেগে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ বলেন, "পরীক্ষার সময়ে আমাদের জামাতের কতিপয় দুর্বলচিত্ত লোকদের সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা হয়। আমার অবস্থা এই যে, আমার নিকট যদি (খোদার পক্ষ থেকে) এই আওয়াজ আসে যে, 'তুমি পরিত্যক্ত, তোমার কোনও কামনা আমি পূরণ করবো না।' তবুও খোদাতাআলার শপথ করে বলছি যে, ঐশী-প্রেম ও ভালবাসায় এবং ধর্মের সেবায় কোনও ত্রুটি ঘটবে না; কেননা আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি' (মলফুযাত, ১ম খন্ড, নবসংস্করণ, পৃঃ ৩০২)।

অতঃপর বলেন, "জীবন যদি খোদারই জন্য হয়ে যায় তাহলে তিনি এর হিফাযত করবেন। সহী বুখারীতে একটি হাদীস আছে, 'যে ব্যক্তি খোদাতাআলার সাথে ভালোবাসার সম্বন্ধ সৃষ্টি করে নেয়, খোদাতাআলা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে হয়ে যান।' অপর একটি হাদীসে আছে, 'তার সঙ্গে বন্ধুত্ব এ পর্যায়ের হয়ে থাকে যে, আমি (আল্লাহ্) তার হাত, পা ইত্যাদি এমন কি, তার জিহ্বা স্বরূপ হয়ে যাই যার দ্বারা সে কথা বলে।' আসল কথা হচ্ছে এরূপ মানুষ নফ্সের ভাবাবেগ মুক্ত হয়ে যায় এবং সে প্রবৃত্তির মন্দ বাসনা ত্যাগ করে খোদার ইচ্ছার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। তখন তার কোনও কাজ নাজায়েয হয় না, বরং তার প্রতিটি কর্ম খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে। তার চেয়েও এগিয়ে- খোদাতাআলা তাকে নিজেরই ক্রিয়া-কর্ম বলে অভিহিত করেন। এ হচ্ছে ঐশী নৈকট্যের সেই একটি মাকাম (স্তর), যেখানে উপনীত হয়ে 'সলূক' (ঐশী অভিযাত্রা)-এর মঞ্জিলসমূহ পুরোপুরিভাবে যারা অতিক্রম করে নি তারা হয়তো পদস্খলিত হয়েছে অথবা 'ইলাহীয়াত' সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং ঐশী নৈকট্যের প্রকৃত মর্ম ও স্বরূপ যারা উপলব্ধি করে নি তারা ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছে।"

এই যে আল্লাহ্তাআলা বলেন- 'আমি তার হাত হয়ে যাই, তার পা হয়ে যাই, তার জিহ্বা হয়ে যাই'-এর কারণে 'ওহদাতুল- ওজূদ' (সর্বেশ্বরবাদ) নামের একটি ফির্কা ইসলামে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তারা এতোই সীমাতিক্রমে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তারা বলতো, খোদা যদি তার পা হয়ে যান তাহলে (প্রতীয়মান হয় যে,) খোদা এবং বান্দা একই বস্তু, কোনও পার্থক্য নেই। কতিপয় অন্যান্য ধর্মেও এই রকমের মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার সৃষ্টি হয়, যা এই বিষয়টি (প্রকৃতভাবে) না বুঝার দরুন সৃষ্টি হয়ে যায়। 'ওহ্দাতুল ওজূদ'-এর মস্লা যদি সত্যসত্যই সৃষ্টি হতে পারতো তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্পর্কে কুরআন করীমে যেসব আয়াত রয়েছে তার দরুনই হতে পারতো- যেমন, **মা রামাইতা ইয্ রামাইতা ওয়া লাকিন্নাল্লাহা রামা**- অর্থাৎ 'তুমি (হে মুহম্মদ) যে তীর নিক্ষেপ করেছিলে সে তীর তুমি নিক্ষেপ কর নি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন অতঃপর বলেন, **ইয়াদুল্লাহে ফওকা আইদীহিম**, অর্থাৎ 'যে হাত ছিল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর, তাঁর নিকট বয়াতকারীদের হাতের উপর, কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, 'তা আল্লাহ্রই হাত যা তাদের হাতের ওপরে' কাজেই 'ওহ্দাতুল ওজূদ'-এর মস্লা যদি সৃষ্টি হতে পারতো তাহলে আবশ্যিকভাবে তাঁরই (সঃ) হতে পারতো। পক্ষান্তরে তিনি সবচে' বেশি তওহীদ (একত্ববাদ)-এর শিক্ষাদান করেছেন, তওহীদেরই গুণ গেয়েছেন। সারা বিশ্ব-জগতে অন্য কোনও নবী তওহীদের সেরূপ খিদমত করেন নি যেরূপ হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) করে গেছেন। 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

এ একই বিষয়-বস্তু সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "কুর্বে-ইলাহী (ঐশীনৈকট্য)-এর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে যারা ব্যর্থ হয়েছেন তারাই ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়েছেন এবং (ফলতঃ) ওহ্দাতুল ওজূদ-এর মস্লা গড়ে নিয়েছেন। এ বিষয়টিও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, যেখানেই মানুষ পরীক্ষায় পড়ে থাকে, সেখানে তার সে-কাজ (আসলে) খোদাতাআলার ইচ্ছার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে।"

'যেখানে মানুষ পরীক্ষায় পড়ে সেখানে (তার) সে-কাজ খোদার ইচ্ছার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়' - এ কথাটি অত্যন্ত গভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা, যা অল্প কথায় বোঝানো কঠিন হবে। প্রকৃতপক্ষে যখনই মানুষ কোন পদস্খলনের শিকার হয়, কোন সন্দেহে আবর্তিত হয় তখন তা এরূপ কর্মের দরুনই হয়, যা খোদাতাআলার ইচ্ছার বিরোধী হয়ে থাকে। হযরত (আঃ) বলেন ঃ

"এরূপ ব্যক্তি তার ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে থাকে, খোদাতাআলার ইচ্ছার অধীনে (সে থাকে) না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআলার 'ওলী' (বন্ধু) বলে গণ্য হয় এবং খোদা যার জীবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, সে ব্যক্তি ঐরূপ হয়ে থাকে যার কোনও কাজই আল্লাহ্র কিতাবের সাথে পরামর্শ ও বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে (সংঘটিত) হয় না। সে তার প্রত্যেক বিষয়, কথা ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে এবং তা থেকে পরামর্শ (ও ফয়সালা) গ্রহণ করে" (মলফূযাত, ১ম খন্ড, নব সংস্করণ, পৃঃ ১১৭)। এখন, পরামর্শ গ্রহণ কথাটির অর্থ হচ্ছে, যখনই কোন কাজ করে বা করতে যায়, তখন বারবার তার মনোযোগ কুরআন করীমের আহ্কামের দিকে নিবদ্ধ হতে থাকে এবং তদনুযায়ী সে কাজ করে। এখন, এটা অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়-বস্তু; সুতরাং আপনারা কার্যত তদ্রূপ করে দেখুন, তাতে জানতে পারবেন, কতো যে কঠিন এই কাজ! সবসময় কুরআনকে নিজের উপর হাকিম ও বিচারক হিসাবে কায়েম রাখা এ বিষয়টি অনেক উঁচু মর্তবা সম্পর্কিত বিষয়, যা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করছেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যায় এরূপ লোক রয়েছেন যারা এই সকল মর্তবার দিকে ক্রমাগত অগ্রসরমান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই কালাম থেকে, যা তিনি পরম নিষ্ঠাবান বান্দাদের সম্পর্কে বর্ণনা করছেন, দুর্বলদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। তাদের মনের ভয় দূর করবার জন্য আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, খোদা পর্যন্ত পৌছবার অসংখ্য মর্তবা বা স্তর রয়েছে। জরুরী করণীয় বিষয় হচ্ছে, সে দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা যেন শুরু করে দেন এবং দোয়া করতে থাকেন। প্রত্যেক কাজ যেন খোদাতাআলার ইচ্ছার সঙ্গে যা সঙ্গতিপূর্ণ হয় আর তা জীবনে রূপ ধারণ করতে থাকে এবং যে সব কাজ খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায় সেগুলি থেকে যেন যথাসাধ্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে থাকেন।

এই যে অগ্রসরমান হবার অবিরাম চেষ্টা তা আবশ্যকীয়। এবং এরই মাঝে আবার শামিল রয়েছে আল্লাহ্তাআলার অসীমতার বিষয়-বস্তুও। কোন ব্যক্তিই খোদাতাআলার দিকে যাত্রা করতে গিয়ে খোদাতাআলার নাগাল পেতে পারে না, কেননা তিনি অনন্ত-অসীম। নবীরাও পেতে পারেন না, তারা তাঁকে পেয়ে তো থাকেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই যার পরেই 'খোদায়ী' শুরু হয়ে যায়। এবং 'ওহ্দাতুল ওজূদ' এটাই যে, এই মাকামের পরেই শুধুমাত্র খোদা বিদ্যমান। 'সিদ্রাতুল-মুন্তাহা'- এর মাঝেও এ পয়গাম বা তত্ত্বটি-ই দেয়া হয়েছে যে, একটি মার্গ পর্যন্ত আঁ হযরত (সঃ) পৌছলেন আর তার পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল 'ওহ্দাতুল ওজূদ'-এর বিষয়-বস্তু, সেখান থেকেও অগ্রযাত্রা ছিল খোদার অসীমতায় হস্তক্ষেপ।

এই মৌলবীরা তো অদ্ভুত অদ্ভুত কিস্সা-কাহিনী তৈরী করে রেখেছে। অবাক লাগে এই লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধির বাহার দেখে, এক মৌলবী সাহেব বক্তৃতায় বয়ান করছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন সিদ্রাতুল-মুন্তাহায় পৌছলেন তখন তিনি চুপ ছিলেন। তখন (নাউযুবিল্লাহ্) খোদাতাআলা কিনা সিনেমার

এই গানটি গাইলেন, 'চুপ চুপ খাড়ে হো জরুর কোই বাত হ্যায় / নয়ী মুলাকাত হ্যায়, পহ্‌লী মুলাকাত হ্যায়'। কী আশ্চর্য! হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তো তাঁর প্রভু আল্লাহ্‌তাআলার সাহচর্যে সবসময়ই থাকতেন, কিন্তু (মৌলবীদের ধারণায়) আজকের সিনেমার এই গান কিনা তখন খোদাতাআলা গেয়েছিলেন, যখন রসূলুল্লাহ্‌র মে'রাজ হয়েছিল। অতএব মৌলবীরা এই ধরনের কিস্‌সা-কাহিনী রচনা করে রেখেছে। খোদাতাআলার শোকর করুন যে, আপনারা মুল্লাতন্ত্রের কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। এটা আল্লাহ্‌তাআলার কতইনা বড়ো ইহ্‌সান। আমি তো এদের (মৌলবীদের) অবস্থা দেখে খোদার শোকর করি কীভাবে যে খোদাতাআলা এই জামাতকে রক্ষা করেছেন এই মৌলভীদের থেকে এবং মৌলবাদ ও মোল্লাতন্ত্র থেকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "মোট কথা, নিশ্চয় স্মরণ রাখবে যে, রসূল (সঃ)-এর কামিল ইত্তেবা ও অনুবর্তিতার সুফলসমূহ কখনও বিনষ্ট হতে পারে না। এটা তাসাওউফের স্বীকৃত মস্‌লা, যদি 'যিল্লি মর্তবা' (প্রতিবিম্বিত মর্যাদা) না হতো, তাহলে এই উম্মতের ওলী-আল্লাহ্‌গণ তো মরেই যেতেন।" 'যিল্লি মর্তবা' অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার রসূল-এর দিক থেকে যে (আত্মিক) প্রতিবিম্বনের বিষয়-বস্তু রয়েছে তা "যদি না হতো তাহলে এ উম্মতের আওলিয়া তো মরেই যেতেন। এই পরিপূর্ণ অনুগমন এবং বুরূযী ও যিল্লি মর্তবা-ই তো ছিল যার দরুন বায়যীদ (বোস্তামী) 'মুহাম্মদ' নামে অভিহিত হয়েছিলেন এবং তা বলাতে সত্তর বার কুফরী ফতোয়া তাঁর বিরুদ্ধে দেয়া হলো এবং তাঁকে দেশান্তরিত করা হলো।" বায়যীদ বোস্তামী একথাই বলতেন যে, 'যিল্লিভাবে (অর্থাৎ আত্মিক প্রতিবিম্বনে) আমি হচ্ছি মুহাম্মদ'। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়ে ছিলেন যে, তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রেমে আত্মবিলীন। সুতরাং বাহ্যদর্শী লোকেরা, যারা তত্ত্ব-কথা বুঝতে পারে না তারা তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বসলো। তেমনি, অনেকে যারা নিজেকে খোদা বলতেন তাদেরকে তারা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল। ওরূপ দাবীদারগণ শেষমুহূর্ত অবধি 'আনাল-হক্' বলতে বলতে কাঠগড়ায় উঠে গেলেন।

অতএব উলামা বা মৌলবীরা প্রত্যেক যুগে যে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে এটা কোন নতুন কথা নয়। সেজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে আজ বিস্মিত বা উদ্বিগ্ন হবার কোনও প্রয়োজন নেই। যখন থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জামানা গত হয়েছে তার পর থেকে এই সব লোক কেবল ফেৎনা-ই সৃষ্টি করতে থাকে, 'আহলে হক্'- সত্যের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধেই ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলীতে যেখানে যেখানে তিনি নিজেকে 'মুহাম্মদ' বলেছেন অথবা এই শ্রেণীর যে সব লেখা রয়েছে সেগুলোই মৌলবীরা বেশি ফলাও করে। পূর্ববর্তীদের সাথেও তারা এ একই ব্যবহার করে এসেছে। সেজন্য এতটুকুও উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। **আল্লাহ্‌তাআলা পরিশেষে তাদের বিষয়ে নিষ্পত্তি করবেন, চূড়ান্ত ফয়সালা দেবেন এবং একটি সময় এরূপ আসবে যখন দুনিয়া তা তাকিয়ে দেখবে, ইনশাল্লাহ্।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আক্ষেপ! তারা যদি এই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত হতো তাহলে তারা জানতে পারতো যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর মর্যাদা ও প্রকৃত স্বরূপকে এই লোকেরা বোঝেই নি, অনুধাবনই করতে পারে নি। যদি আঁ হযরত (সঃ)-এর পায়রবী ও অনুসরণের প্রভাব ও সুফল সমূহ-ই অব্যাহত না থাকে তাহলে তো আঁ হযরত (সঃ)-এর আত্মিক জীবনের প্রমাণই বা কী থাকে যখন কিনা এর ফল ও কল্যাণসমূহ আমরা পেতে না পারি? আমি সত্যসত্য বলছি যে, এটা এক বাজে ও কুফরী ধারণা বৈ কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুবর্তিতার (আত্মিক) সুফলসমূহ এখনও এবং সদা-সর্বদা লাভ করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলার সত্তায় কার্পণ্য নেই। এবং তাঁর কাছে কোনও কিছুর অভাবও নেই" (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, নবসংস্করণ, পৃঃ ৪০৬)। অতঃপর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর খাঁটি অন্তঃকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁর প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানিয়ে দেয়। তা এভাবে হয় যে, সেরূপ অবস্থায় তার হৃদয়ে খোদা-প্রেমের একটি দহন ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। তখন ওরূপ ব্যক্তি সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে খোদার দিকে ঝুঁকে যায় এবং তার অনুরাগ ও অভিলাষ কেবল আল্লাহ্‌র সাথে অবশিষ্ট থেকে যায়, তখন তার ওপর খোদাপ্রেমের একটি বিশেষ আলোকসম্পাত হয় এবং খোদা তাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রঙ ও প্রবল আবেগ দিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের ওপর জয় লাভ করে এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক থেকে খোদাতাআলার 'খারেক আদৎ' (অলৌকিক অর্থাৎ দুনিয়াদার সাধারণ লোকদের সাথে যে ধারায় ব্যবহার হয়ে থাকে তা ব্যতীত এক অসাধারণ ব্যবহার তার বেলায় করা হয়। অতএব খোদাতাআলার 'খারেক আদৎ') অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২২, পৃঃ ৬৭-৬৮)।

এখন, পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাত্র একটি উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই অনেকগুলি উদ্ধৃতি ছেড়ে দিয়েছি এজন্যে যে, আজ জুমুআর নামাযের পরে যেমন আগেই বলেছি, তিনটি বিয়ের এলানও করতে হবে।

হযরত (আঃ) বলেন, "আমি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর উপর হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম) কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী! তাঁর উচ্চ মর্যাদার সীমা-পরিসীমা সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয়। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোসের বিষয়, যেভাবে সনাক্ত করা উচিত তাঁর মর্যাদাকে সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তৌহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তিনিই একমাত্র মহাবীর তা পুনরায় দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন। তিনি খোদাকে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছেন এবং আদম-সন্তানের জন্যে চূড়ান্ত সহানুভূতিতে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই জন্যে খোদা, যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন তিনি তাঁকে সকল নবীর, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করেছেন। ইনিই তিনি যিনি প্রত্যেক কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কল্যাণরাজীকে স্বীকার না করে কোনও মর্যাদালাভের দাবী করে সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রত্যেক মর্যাদার চাবিকাঠি তাঁকেই দান করা হয়েছে" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, পৃঃ ১১৮, ১১৯)। (পুনঃ প্রকাশিত)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(২৫-১২-০১ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ আমেরিকা থেকে এক আহমদী ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন আমাদের জামাতের একটা স্লোগান "ভালবাসা সবার জন্য ঘৃণা কারও জন্য নয়"। সেটি ওসামা বিন্ লাদেন-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে সকলে ভালবাসতে পারে না। তবে কিছু লোক তাকে এখনও ভালবাসে কারণ সে তার পুরো জীবন ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের ভালবাসা সে অন্য খাতে প্রবাহিত করেছে। সে যেই ঘৃণা আমেরিকাবাসীদের অন্তরে সৃষ্টি করেছে সেটা ভিন্ন কথা; কিন্তু যতদূর তার ইসলামের জন্য ভালবাসা ও ইসলামের জন্য তার ত্যাগের সম্পর্ক আছে সেটাও অস্বীকার্য।

মোল্লা উমর কিন্তু আরামের জীবন যাপন করেছে যা ওসামা বিন্ লাদেন কখনও করে নি। আল্লাহ্ ওসামার উপর দয়া করুন! আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা করি না। সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ভুল পথে পা বাড়িয়েছে; কিন্তু সে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। তার বিশাল সম্পদ সে নিজের আরাম-আয়েশের জন্য খরচ করে নি। ইচ্ছা করলে রাজার হালে থাকতে পারতো কিন্তু সে সাদাসিদে জীবন যাপন করেছে এবং ইসলামের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছে।

[এখন হুযূর (আইঃ) কর্তৃক রচিত একটি নযম পাঠ করে শুনান জনাব তারেক যুবায়ের। মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এর অনুবাদ করেন]

প্রশ্ন নং ২ ঃ গত অধিবেশনে হুযূর বলেছিলেন, জিন্ন সম্পর্কে আপনার যে কিছু অভিজ্ঞতা তা আমাদেরকে বলবেন। দয়া করে আজ সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলবেন কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমি এক গরমের দিনে ঘুমিয়ে ছিলাম। বাসায় কেউ ছিল না। আমার স্ত্রী মায়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার মনে হ'ল কেউ আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার উপর শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। তার উচ্চতা বেশি ছিল না মানে লোকটা বেটে ধরনের ছিল। আমি প্রথমে মনে করলাম, আমি Night Mare (ভয়ের স্বপ্ন) দেখছি। আমি খুব চেষ্টা করে আমার চোখ খুললাম এবং তার দিকে তাকালাম। সে আমাকে রেগে যেতে দেখে আমার ঘরের সংলগ্ন গোসল খানায় চলে গেল। পাকিস্তানে ঘরের দুটো দরজা থাকে- একটাতে পুরোটা কাঠ থাকে, সেটাকে বন্ধ করলে বাইরের কিছুই দেখা যায় না, আর একটার দরজার ফ্রেমে লোহার তারের জালি লাগানো থাকে; সেটা বন্ধ করলেও বাতাস ঘরে ঢুকতে পারে। আমি লক্ষ্য করলাম সেই ব্যক্তি আমার বাথরুমে ঢুকলো, আমার Razor নিল, Blade বদলালো। আমারও ইতঃপূর্বে Blade বদলাবার ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে, সে কাজটা পরের দিন করবো। আজ দেখলাম, আমার কাজটা সে-ই করলো এবং বাথরুম থেকে বের হয়ে গেল। আমি দেখলাম আমার ঘরের দরজা সবটাই বন্ধ রয়েছে। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন আমি বাথরুমে ঢুকলাম, আমি দেখে আশ্চর্য হলাম সত্যি সত্যিই আমার রেজর-এর ব্লেড বদলানো আছে। অন্য কোন লোক সেই কাজটি করতেই পারতো না। নিশ্চয় গতরাতে জিন্ন এসেই কাজটি করেছিল।

জিন্নরা অদ্ভুত হয়ে থাকে। আমি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের কাছে শুনেছি তিনি-ও জিন্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তার পরিবার একদিন বাসায় ছিল না অর্থাৎ তিনি বাসায় একা ছিলেন। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর পায়ের উপর কেউ চাপ দিচ্ছে। চাপটা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি উঠে গেলেন এবং যে চাপ প্রয়োগ করছিল নিজের অভ্যাস মত তাকে বললেন, "তুমি কে আমি জানি না। তোমাকে যদি আল্লাহ্ পাঠিয়ে থাকেন তো আল্লাহ্র ইচ্ছাই পূরণ হবে। আমি তোমাকে মোটেও ভয় করি না। কিন্তু তুমি যদি নিজে থেকে এ কাজ করে থাকো তা হলে মনে রেখো আমি তোমার ধারধারি না"। এরপর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বুঝতে পারলেন যে, পায়ের উপর আর সেই চাপ নেই। তিনি অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালালেন। তিনি দেখলেন, দরজা আগের মত বন্ধই আছে। অর্থাৎ বাইরের থেকে কেউ ঘরে ঢুকে নি। তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবে তিনি আমাদের কাছে জিন্ন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন।

আমার নিজের আর একটি ঘটনা বলি। আমি একদিন আমার অফিস থেকে বাসায় ফিরলাম। আমার ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। আমি মনে করলাম হয়তো ভিতরে যেই ছিটকানী দরজার নীচের দিকে থাকে ওটা নিজে নিজে পড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু যখন ভাল করে দেখলাম তো বুঝতে পারলাম যে, দরজা তো ভিতর থেকে লাগানো হয় নি বাইরে থেকে বন্ধ করা হয়েছে। আমি কোনমতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। আমি আমাদের ঘরের দরজা জানালা এমনকি 'ভেন্টিলেটার' পর্যন্ত বন্ধ করেছিলাম। আবার যখন আমি বাইর থেকে ঘরে ফিরলাম আমার ঘরটা আগের মত বন্ধ পেলাম। আমি আমার বোন আম্তুল বাসিত ও অন্য এক আত্মীয়কে ডাকলাম। তাদেরকে ব্যাপারটা দেখালাম। আমার জনৈক আত্মীয়কে 'ভেন্টিলেটার' পরীক্ষা করতে উপরে পাঠালাম। সে বললো, 'ভেন্টিলেটার' ভিতর থেকে বন্ধ আছে। যাক 'ভেন্টিলেটারটা' কোন রকম করে খুলে সে ঘরের ভিতরে ঢুকলো এবং অন্য দরজাগুলো খুলে দিল। এই হলো আমার দু'টি অভিজ্ঞতা। এগুলো থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন বলে একটি সত্তা অবশ্যই আছে।

এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিলো করাচীতে। আমরা তারেক রোড থেকে সমুদ্র সৈকতে যাবো বলে ঠিক করেছিলাম। আমার

ইচ্ছা ছিল সঙ্গে একটা 'টেপরেকর্ডার'ও নিয়ে যাবো কিন্তু তার মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল। তারেক রোডের এক দোকানে সেই 'টেপ রেকর্ডারটি' ঠিক করতে দিয়ে যাবো। আমার সঙ্গে মোবারক খোখার বলে এক ব্যক্তিও ছিল। আমরা সবাই একই মোটর গাড়ীতে গেলাম এবং তারেক রোডের এক গলিতে ঢুকলাম। হঠাৎ আমি এক মহিলাকে দেখলাম। সে বোরখা পড়ে ছিল; কিন্তু তার চোখ দু'টো অদ্ভুত ধরনের ছিল। আমার সহযাত্রীরাও এটা লক্ষ্য করলো, ঠিক যেন তার চোখে Mesmerism (সম্মোহন) করার শক্তি ছিল। আমি গাড়ী থেকে বের হয়ে 'টেপরেকর্ডারের' দোকানে দিলাম। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, খোখারের স্ত্রী সেই অদ্ভুত মহিলার সাথে কথা বলছেন এবং মোবারক খোখারও গাড়ী থেকে বের হয়ে একটি অদ্ভুত ধরনের ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। আমি দোকানের ভিতর গেলাম আমার কাজ শেষ করে আমি যখন গাড়ীতে ওঠার জন্য ফিরে এলাম তখন আমি খোখার দম্পতিকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই অদ্ভুত মহিলাটি এবং ঐ লোকটি কে? তারা আশ্চর্য হ'ল এবং আমাকে বললো, "আপনি কি বলছেন? আপনিই তো সেই মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা দু'জন তো তার সাথে মোটেই কথা বলি নি।" তখন আমি বললাম, তোমরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো? তখন খোখার দম্পতির কন্যা বলে উঠলো, "মামু জান! আপনিই তো সেই মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা কেউ তার সাথে কথা বলি নি"। এ ঘটনা এতই গোলমেলে ছিলো যে, আমার মনে হয় সেই মহিলাটি নিশ্চয়ই জিন্ন ছিল'।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ হুযূর আপনি জিন্নের যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং গয়ের আহমদী মোল্লারা জিন্ন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার মধ্যে পার্থক্যটা কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমি যে জিন্নের কথা বলেছি তার অস্তিত্ব বাস্তব। পরীক্ষিত। তারা যে জিন্নের কথা বলে তার কোন অস্তিত্ব নেই। অ-আহমদী মোল্লাদের উদ্দেশ্য অন্য রকম হয়ে থাকে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তারা বলে থাকে, তারা জিন্নদের বশীভূত করে তাদের মাধ্যমে অনেক কাজ আদায় করতে পারে যেমন ভাল ভাল খাবার আনতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটাতে পারে। তাদের জিন্ন কাল্পনিক। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সঠিক বর্ণনা দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ চট্টগ্রাম থেকে এই প্রশ্ন এসেছে ঃ মহানবী (সঃ) মি'রাজে 'সিজদারাতুল মুনতাহা'য় পৌঁছে গিয়েছিলেন। হুযূর দয়া করে বুঝিয়ে বলুন 'সিদরাতুল মুনতাহা' এর অর্থ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মি'রাজের রাতে রসূল করীম (সঃ)-এর যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছে এটা তার একটা প্রতীকী শব্দ। আল্লাহ্‌র কয়েকটি গুণ এতই বড় যে, মানুষ সে গুণ অর্জন করতে পারবে না। মানুষ যেসব গুণ অর্জন করতে পারে তার উচ্চতম স্তর এবং আল্লাহ্‌তাআলার নিজস্ব গুণাবলীর মধ্যে যেই সীমারেখা আছে সেটাকে বুঝাবার জন্য 'সিদরাতুল মুনতাহা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) একমাত্র মানব যিনি সেই সীমারেখার নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এটা কোন গাছ নয়। সীমারেখা চিহ্নিত করার জন্য কৃষকরা বরই (কুল) গাছ লাগিয়ে থাকে। 'সিদরাতুন' শব্দের অর্থ বরই (কুল) গাছ। 'মুনতাহা' শব্দের অর্থ শেষ সীমানা। এর থেকে কেউ যেন মনে না করে যে, উর্ধ্ব আকাশে বা আধ্যাত্মিক জগতে কোথাও কুল গাছ লাগানো আছে। আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ বলেছেন, মহানবী (সঃ) তাঁর গুণাবলী দ্বারা মানুষের পক্ষে যত উন্নতি করা সক্ষম তার সবটাই অর্জন করেছিলেন যা অন্য কোন মানুষ কখনও করতে পারে নি আর পারবেও না।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটা ইল্‌হাম আছে ঃ ঈদ হ্যা চাহে মানেঁ চাহে না মানেঁ। হুযূর এটার অর্থ একটু ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যুগে একবার ঈদের দিনকে নিয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। সে রকম ঝগড়া আজকালও মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। আল্লাহ্‌তাআলা উপরোক্ত পরিস্থিতি হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, তুমি যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছো সেটাই ঠিক। অন্যেরা কি বলছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করো না।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ চট্টগ্রাম থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন, বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অসাধারণ অগ্রগতি হচ্ছে এটার কি আল্লাহ্‌তাআলার গুণ 'রবুবীয়্যত'-এর সাথে সম্পর্ক আছে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই আছে। 'রবুবীয়্যত'-এর অর্থ ব্যাপক। আল্লাহ্‌তাআলা যে পৃথিবীর সব প্রাণীদের খাদ্য সরবরাহ করছেন, অন্যান্য উপকরণ দিচ্ছেন সবই তো 'রবুবীয়্যত'-এরই বহিঃপ্রকাশ। শিল্পক্ষেত্রে যে সব উন্নতি হচ্ছে, নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে সবই 'রবুবীয়্যত'-এর নিদর্শন।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ পবিত্র কুরআনে আছে আল্লাহ্‌তাআলা যখন ফিরিশ্‌তাগণকে জানালেন যে, তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তখনই ফিরিশ্‌তাগণ বলেছিল, মানুষ সৃষ্টি করলে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। হুযূর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কি মনে হয় না যে, ফিরিশ্‌তারা যা আশংকা করেছিল তা অমূলক প্রমাণিত হয় না?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটাও একটা রূপক কথা। ফিরিশ্‌তারা আল্লাহ্‌র কথার ওপরে আপত্তি করতে পারে না। আল্লাহ্‌ই ফিরিশ্‌তাগণকে জানিয়ে ছিলেন যে, আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পরে হবে। কিন্তু রক্তারক্তি আদম বা আদম এর অনুসারীরা করবে না তাদের বিরুদ্ধবাদীরা শুরু করবে এবং আদম-ও তার মতন অন্যান্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণ শুধু প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করবেন। আল্লাহ্‌তাআলা ফিরিশ্‌তাগণের কাছে নবীগণের নামগুলোও বর্ণনা করেছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা যখন ব্যাপারটা ফিরিশ্‌তাদের বুঝিয়ে বললেন তখন ফিরিশ্‌তাগণ লজ্জিত হয়েছিল।

সংকলন ও অনুবাদ-নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

সংশোধনী

বিগত সংখ্যার 'মুলাকাৎ' শীর্ষক প্রশ্ন-উত্তর আলোচনার ১৪নং প্রশ্নের উত্তরের ৫ম লাইনে 'তাহাজ্জুদ' স্থলে 'বিতর' পড়তে হবে। অনবধানবশতঃ মুদ্রণজনিত এ ভুলের কারণে আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

বিশ্ব মুসলিমের জন্য চিন্তার কারণ

[আজ থেকে ১৯ বছর পূর্বে (বর্তমানে ৫৫ বছর) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর সময়োপযোগী সতর্ক বাণী]

[১৯৪৭ সনের মে মাসে বৃহৎ শক্তিবর্গের সহযোগিতায় যখন ইসরাঈল রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হ'ল, তখন আহমদীয়া জামাতের ইমাম সৈয়্যদনা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বিশ্ব-মুসলিমকে এই নতুন বিপদের ব্যাপকতার অনিষ্টকারিতা এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্ব-মুসলিমকে সতর্ক করে এটা প্রতিরোধের সঠিক পন্থা সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন। হুযূর এ প্রসঙ্গে তৎকালে বিশ্ব-মুসলিমের নিকট যে, কার্যকরী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন তদনুযায়ী এবং বর্তমানে ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তনের কারণে সৃষ্ট বিপদ আরও শোচনীয়রূপ ধারণ করায় সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা আরও অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে হুযূর (রাঃ)-এর অতি মূল্যবান নির্দেশসমূহ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে বর্ণিত হ'ল] ঃ

১। সে সময় যার সংবাদ কুরআন ও হাদীসে শত শত বছর পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং সে সময় যার সংবাদ তওরাত ও ইঞ্জিলেও বর্ণিত হয়েছে এবং সেদিন যা মুসলমানদের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক ও ভয়াবহ বর্ণিত হয়েছে মনে হচ্ছে তা আগত প্রায়। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদেরকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। রুশ ও আমেরিকা যদিও একে অপরের শিরচ্ছেদে প্রস্তুত কিন্তু এ ব্যাপারে দেখা যায় যে, তারা একই নৌকার সহযাত্রী। আরও আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে, কাশ্মীর প্রশ্নেও তারা একতাবদ্ধ ছিল এবং উভয় রাজ্যই ভারত সরকারকে সমর্থন করে। বর্তমানে প্যালেস্টাইন প্রশ্নে উভয় রাষ্ট্রই ইহুদীদেরকে সমর্থন যোগাচ্ছে।

২। আশ্চর্যের কথা এই যে, একই সময়ে কাশ্মীর ও প্যালেস্টাইনের বিবাদ আরম্ভ হয়েছে। ইহাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কাশ্মীর এবং প্যালেস্টাইনে একই জাতি আবাদ রয়েছে এবং আশ্চর্যের কথা যে, এ জাতির একাংশ মুসলমান হয়ে আজ কাশ্মীরে মুসলমানদের সহানুভূতি আকর্ষণ করছে এবং অপরাংশে প্যালেস্টাইন মুসলমানদের সাথে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত আছে। জাতির অর্ধাংশ ইসলামের জন্য জীবন দান করছে এবং অপরাংশ ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলবার জন্য জীবন দান করছে। কাশ্মীরের যুদ্ধেও কাশ্মীর অর্থাৎ কাশ্মীরীদের নাম শুনা যায় এবং প্যালেস্টাইনের যুদ্ধেও কাশ্মীর নগরীর উল্লেখ পুনঃ পুনঃ শুনা যায়। এই কাশ্মীর নামের উপরেই কাশ্মীরের নাম কাশ্মীর রাখা হয়েছিলো এবং বর্তমানে বিকৃত হইয়া কাশ্মীর হয়েছে অথবা কাশীর অর্থাৎ সিরিয়ার মত।

৩। কাশ্মীরের বিষয়টি পাকিস্তানবাসীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীরের আঘাত প্রত্যক্ষ আসছে আর এবং প্যালেস্টাইনের আঘাত পরোক্ষভাবে। প্যালেস্টাইন আমাদের প্রিয় প্রভুর (সঃ) অন্তিম বিশ্রামস্থলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাঁর জীবদ্দশায় ইহুদীগণ সর্ব প্রকারের সদ্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও অতি ঘৃণিত ও নির্লজ্জভাবে তাঁর বিরোধিতা করত এবং অধিকাংশ যুদ্ধ এই ইহুদীদের উস্কানিতেই সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে হত্যা করবার জন্য পারশ্য সম্রাটকে তারাই উস্কানি দিয়েছিল। কিন্তু পরম দয়ালু খোদা তাদের মুখে কালিমা লেপন করেছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা তারা নিজেদের ঘৃণিত অন্তরের প্রকাশ করে দিল। আহযাব যুদ্ধের কর্তৃত্বভার এদের হাতেই ছিল। ইতঃপূর্বে সমগ্র আরব দেশ অনুরূপভাবে আর কখনও একতাবদ্ধ হয় নি। মক্কাবাসীদের মধ্যে শৃঙ্খলা মোটেই ছিল না। মদীনা হতে বিতাড়িত ইহুদীগোত্রসমূহের কার্যকলাপের ফলেই সমস্ত আরব একতাবদ্ধ হয়ে মদীনার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দয়ালু খোদা তাদের মুখেও কালিমা লেপন করে দিয়েছিলেন। তথাপি ইহুদীরা নিজ সাধ্যমতে কোন ত্রুটি বাকী রাখে নি। মক্কাবাসী রসূল করীম (সঃ)-এর শত্রু ছিল বটে কিন্তু প্রবঞ্চনামূলে কখনও তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করে নি। তায়েফ যাওয়ার কারণে আইনতঃ তিনি নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি মক্কায় ফিরে আসলেন তখন মক্কাবাসীদের মধ্য হতে জনৈক তাঁর ঘোর শত্রু তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসল এবং মক্কাবাসীদের নিকট ঘোষণা করল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-কে আমি নাগরিক অধিকার প্রদান করলাম এবং সে নিজ পাঁচ পুত্রসহ হুযূর (সঃ)-এর সাথে মক্কায় প্রবেশ করল এবং নিজ পুত্রদিগকে বলল, যদিও মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের শত্রু তথাপি আরবের শালীনতায় এটাই বলে যে, যখন তিনি আমাদের সাহায্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চাচ্ছেন তখন তার প্রার্থনা পূরণ করাই আমাদের কর্তব্য নতুবা আমাদের মর্যাদা থাকবে না। সে নিজ পুত্রদিগকে বলল, যদি কোন শত্রু তাকে আক্রমণ করতে আসে তবে তাদের সকলের মৃত্যুর পূর্বে যেন কেউ তার নিকটবর্তী হবার দুঃসাহস করতে না পারে। এরূপ ছিল মর্যাদাশীল আরব শক্তি। এর বিপরীতে সেই দুর্ভাগা ইহুদী জাতি, পবিত্র কুরআন যাদিগকে মুসলমানদের সর্বপ্রধান শত্রু বলে উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে তারা নিজ বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এবং শান্তি প্রস্তাবের ধোঁকা দিয়ে বাড়ির ছাদ হতে তাঁর উপর জাতার পাটা নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু খোদাতাআলা তাদের এ দুরভিসন্ধির কথা তাঁকে জানিয়ে দিলেন এবং তিনি নিরাপদে আসলেন। ইহুদী জাতির জনৈকা স্ত্রীলোক তাকে নিমন্ত্রণ করে বিষ মিশ্রিত খাদ্য তাকে খাওয়ায় কিন্তু খোদাতাআলা তাঁকে এ যাত্রাও রক্ষা করলেন। কিন্তু ইহুদী জাতি তাদের অন্তরের পরিচয় প্রদান করল।

এরাই সে শত্রু যারা মদীনারই নিকটবর্তী এলাকায় এক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। সম্ভবতঃ এ আশায় যে, নিজেদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে পরে

মদীনাভিমুখী অগ্রসর হবে। যে সমস্ত মুসলমান মনে করে যে, এর সম্ভাবনা খুব দুর্বল তাদের নিজেদের বুদ্ধিই দুর্বল। আরবগণ এ সত্যকে বুঝে। তারা জানে যে, ইহুদীগণ এখন আরবদিগকেই আরব ভূমি হতে বিতাড়িত করবার চেষ্টায় আছে। তাই তারা (আরব) নিজেদের ভিতরের সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ ও বিভেদকে ভুলে গিয়ে এবং একতাবদ্ধ হয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আরবদের কি সেই শক্তিক্ষমতা আছে? এ ব্যাপারটা কি শুধু আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ? ইহা সর্বজন বিদিত যে, না আরবদের সে ক্ষমতা আছে এবং না ব্যাপারটা শুধু আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন প্যালেস্টাইনের নয় প্রশ্ন হচ্ছে মদীনার। প্রশ্ন শুধু যেরুজালেমের নয়, প্রশ্ন হচ্ছে পবিত্র মক্কার। এখানে প্রশ্ন যায়েদ ও বকরের নয়। প্রশ্ন হচ্ছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মর্যাদার। শত্রুগণের আপসের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তারা আজ ইসলামের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে একতার সহস্র কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি তারা এ সময় একতাবদ্ধ হবে না?

৪। এখন চিন্তা করবার সময় এসেছে যে, আমরা কি পৃথক পৃথকভাবে মরতে চাই না সকলে একতাবদ্ধ হয়ে বিজয় লাভের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য। আমি মনে করি, সময় আগত এবং মুসলমানদেরকে মীমাংসা করতে হবে যে, হয়ত শেষ চেষ্টা করে নিজেদের জীবন বিসর্জন করবে নতুবা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্রকে চিরতরে শেষ করবে। মিসর, সিরিয়া এবং ইরাকের মিলিত বিমান শক্তি একশ' বিমানের অধিক হবে না, কিন্তু ইহুদীরা তদপেক্ষা দশগুণ অধিক শক্তি অতি সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে।

যা হোক, মুসলিম জগতকে রুশ ও আমেরিকা উভয়ের সাথে শক্তি পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা। যে কাজ ঐক্য এবং একতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা। আমি মনে করি, পৃথিবীতে এখনও যত মুসলমান আছে তারা যদি সকলে মরতে প্রস্তুত হয় তবে তাদেরকে কেউই মারতে পারবে না। কিন্তু আমার এ আশা কতটা সফল হবে তা আল্লাহ্তাআলাই জানেন।

৫। আজ প্রস্তাব দ্বারা কোন কাজ হবে না, আজ শুধু আত্মত্যাগ দ্বারাই কাজ হবে। যদি পাকিস্তানের মুসলমান সত্যিই কিছু করতে চায়, তবে নিজ সরকারকে অবহিত করুন যে, আমাদের সম্পত্তির ন্যূনকল্পে এক শতাংশের আপাততঃ তারা গ্রহণ করুন। পাকিস্তান এক শতাংশ দ্বারাই একাজের জন্য একশ' কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারবে। এবং একশ' কোটি দ্বারা মুসলিম দেশ-সমূহের বহু সমস্যার মীমাংসা করতে পারবে। পাকিস্তানের এই কুরবানী দ্বারা অন্যান্য দেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে তারাও কুরবানী করবে এবং এ উপায়ে অবশ্য পাঁচ ছয় শ' কোটি টাকা সংগ্রহ হতে পারবে। যদ্বারা প্যালেস্টাইনের জন্য ইউরোপীয় দেশসমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও অপরাপর দেশ হতে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা যেতে পারবে। এক টাকার পরিবর্তে দুই টাকা, দুই টাকার পরিবর্তে তিন টাকা, তিন টাকার পরিবর্তে চার টাকা, চার টাকার পরিবর্তে পাঁচ টাকা ব্যয় করলে নিশ্চয় কোন না কোন স্থান হতে জিনিস পাওয়া যাবে। ইউরোপীয়দের সততার মূল্য নিশ্চয় আছে এবং সে জন্য অধিক মূল্য দিতে হতে পারে। তাদেরকে অবশ্যই খরিদ করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে। কিন্তু চড়া ডাক দেয়ার জন্য পকেট ভর্তি টাকা থাকা দরকার। অতএব আমি মুসলমানদেরকে অবহিত করছি, তারা সঙ্কটপূর্ণ সময়কে অনুধাবন করুন এবং স্মরণ রাখুন যে, আজ রসূল করীম (সঃ)-এর এই বাণী আল্ কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদা- কাফিররা একই জাতি- অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে চলেছে। ঈহুদী ঈসায়ী এবং জড়বাদীগণ একতাবদ্ধ হয়ে ইসলামের মর্যাদাকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয় শক্তিসমূহ পৃথক পৃথকভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করত। এখন সমস্ত শক্তি একতাবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করে। কারণ এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। যে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই, তন্মধ্যে কোন মতানৈক্য আনয়ন করা নেহায়েত বোকামী এবং মূর্খতার লক্ষণ।

৬। আজ দুশমন যখন ইসলামের মূলদেশে কুঠার হেনেছে যখন মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ সত্যিকারভাবে বিপদগ্রস্থ তখনও কি সময় হয় নি যে, পাকিস্তানী, আফগানী, ইরানী, মালয়ী, ইন্দোনেশীয়, আফ্রিকাবাসী, বারবারী, তুর্কী সকলে একত্রিত হয়ে যায় এবং আরবদের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুগণের সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করে, যা ইসলামের শক্তিকে চূর্ণ করতে এবং ইসলামকে লাঞ্ছিত করতে চাচ্ছে।

৭। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন ও হাদীস দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ইহুদীগণ আর একবার প্যালেস্টাইনে আবাদ হবে, কিন্তু ইহা তো বলা হয় নি যে, তারা চিরস্থায়ীভাবে প্যালেস্টাইনে আবাদ হবে প্যালেস্টাইনে চিরস্থায়ীভাবে রাজত্ব করবে। ইবাদাল্লাহি সলিহূনা অর্থাৎ আল্লাহ্র পুণ্যবান বান্দাগণ, বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

অতএব আমরা যদি তাকওয়ার সাথে কাজ করি তবে আল্লাহ্তাআলার প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী এভাবেও পূর্ণ হতে পারে যে, ইহুদীরা সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কিন্তু আমরা যদি তাকওয়ার সাথে কাজ না করি তা হলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী দীর্ঘকাল যাবৎ বলবৎ থাকতে পারে। ইসলামের জন্য উহা এক ভীষণ আঘাতের কারণ হবে। সুতরাং আমাদের উচিত, আমাদের আমল দ্বারা, আমাদের কুরবানী দ্বারা, নিজেদের মধ্যে একতার দ্বারা এবং দোয়া ও বিলাপ দ্বারা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর স্থিতিকাল সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর এবং প্যালেস্টাইনের উপর মুহাম্মদ (সঃ)-এর রাজত্বকে নিকট হতে নিকটতর করি এবং আমি মনে করি যে, আমরা যদি এরূপ করি তবে ইসলামের বিরুদ্ধে যে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তা বিপরীতমুখী হয়ে পড়বে এবং ঈসায়ী মতবাদ দুর্বলতা ও অধঃপতনের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং মুসলমানগণ আর এক বার উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সম্ভবতঃ এ কুরবানী মুসলমানদের হৃদয়কে পরিষ্কার করে তাদের মনকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে দিবে। তাদের হৃদয় হতে দুনিয়ায় ভালবাসা বিদূরীত হয়ে খোদা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর এবং তাঁর ধর্মের প্রতি সম্মান ও ইজ্জত প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে তাদের ধর্মহীনতা ধর্মে, বেঈমানি ঈমানে, তাদের অলসতা তৎপরতায় এবং কুকর্ম অবিরাম চেষ্টায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে ('আল্ কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা' প্রবন্ধ থেকে সংকলিত অনুবাদটি চলতি ভাষায় সম্পাদনা করে পুনঃ প্রকাশ করা হলো- নির্বাহী সম্পাদক)।

উর্দূ থেকে অনুবাদ-চৌধুরী সাহাবুদ্দীন আহমদ

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(১২তম কিস্তি)

কুরআন করীম তিলাওয়াতের দোয়া

♦ কুরআন করীম তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বে তাআ'উয অর্থাৎ **আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বনির রজীম** পাঠ করতে হয়। অর্থাৎ বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি। তদুপরি প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুর ন্যায় তিলাওয়াতের প্রথমে **বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম** পাঠ করাও কল্যাণের কারণ।

♦ হযরত আওফ (রাঃ) বিন মালিক আশজা'ই বর্ণনা করেন। আমি রসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে নফল নামাযের জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি (সঃ) সূরাতুল বাকারাহ্-এর তিলাওয়াত করলেন। তিনি কোন রহমত সম্পর্কিত এমন কোন আয়াত তিলাওয়াত করেন নি যেখানে থেমে গিয়ে রহমতের ও দয়ার জন্যে দোয়া না করেছেন আর এমন কোন আযাবের আয়াতও তিলাওয়াত করেন নি যেখানে থেমে আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়ায় দোয়া করেন নি (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত)।

♦ হযরত হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় ইহাও উল্লেখ আছে যে, যেখানে তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণার) করার সুযোগ এসেছে সেখানে তিনি (সঃ) **সুবহানাল্লাহ্** (আল্লাহ্ পবিত্র) বলতেন (মুসলিম, কিতাবুস্ সলাত)।

♦ হযরত ওয়ায়েল (রাঃ) বিন হাজর বর্ণনা করেন। আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সূরাতুল ফাতিহাহ্ তিলাওয়াত করতে শুনি। **ওয়ালায্ যোয়াল্লীন** পড়ার পর তিনি উচ্চ শব্দে বল্লেন, 'আমীন' (তথাস্তু, তা-ই যেন হয়) (আবূ দাউদ, কিতাবুস্, সলাত)।

♦ হযরত আবূ মায়সরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সূরাতুল বাকারাহ্‌র দোয়া সম্বলিত আয়াতের শেষে জিবরাঈল (আঃ) 'আমীন' বলার জন্যে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিলেন।

(আল্ ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১০৭, আল্লামা সা'ইউতী, বৈরুতে ছাপা)।

♦ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবাদের সামনে সূরাতুর রহমান তিলাওয়াত করেন। সাহাবা (রাঃ) চুপ করে তিলাওয়াত শুনেন। তিনি (সঃ) বললেন, তোমাদের চেয়ে জিন্ন জাতিই তো ভালো ছিল যারা এ সূরাহ্‌র তিলাওয়াত শুনার সময় প্রত্যেক বার

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

(**ফাবিয়ায়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকাযযিবান**) আয়াত (অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করবে?) শুনার পরে জবাবে বলতো

لَا بِشَیْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ

(**লা বিশাইইম্মিন নি'য়ামিকা রব্বানা নুকাযযিবু ওয়া লাকাল হামদু**) অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা তোমার নেয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করি না। আর সমস্ত প্রশংসা তোমারই (তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর সূরাতুর রহমান)।

♦ হযরত উক্ববাহ্ (রাঃ) বিন আমের বর্ণনা করেন। যখন সূরাতুল ওয়াক্বিআহ্-এর এ আয়াত

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

(**ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রব্বিকাল 'আযীম** (অতএব নিজের মহান প্রভু-প্রতিপালকের নামের তসবীহ্ করো) অবতীর্ণ হলো তখন নবী করীম (সঃ) বল্লেন, উহাকে রুকূর মধ্যে নিয়ে নাও অর্থাৎ রুকূতে **সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম** (অর্থাৎ এ আয়াত তিলাওয়াত করার পরেও **সুবহানা রব্বিআল 'আযীম** অর্থাৎ মহান প্রভু-প্রতিপালক (আল্লাহ্) অতি পবিত্র-পড়া আমল (থেকে সাব্যস্ত)। এভাবেই যখন রসূল করীম (সঃ)-এর ওপরে আয়াত ঃ

♦ **সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা** অবতীর্ণ হয় তখন তিনি বলেন একে সিজদাহ্-এর মধ্যে পড়ো (অর্থাৎ এ আয়াত পড়ার পরে **সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা**- মহান প্রভু-প্রতিপালক (আল্লাহ্) অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী- পাঠ করতে হয়- অনুবাদক) (আবূ দাউদ কিতাবুস্ সলাত)।

♦ সূরাতুল মূলক-এর শেষ আয়াত **ফামাঁইয়া'তিকুম বিমায়িম্মা'ঈন** (অর্থাৎ তাহলে কে আছে যে তোমাদের জন্যে প্রবহমান পানি এনে দেবে)-এর জবাবে **আল্লাহু রব্বুল আলামীন** (আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক) বলা মুস্তাহাব (ভাল) (তফসীরে জালালায়ন, সূরাতুল মূলক)।

♦ হযরত মূসা বিন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ঘরের ছাদে নামায পড়ছিলো যখন সে সূরাতুল ক্বিয়ামাহ্-এর শেষ আয়াত পড়লেন- **আলায়সা যালিকা বি ক্বাদিরিন 'আলা আঁইউহিয়াল মাওতা** (অর্থাৎ তথাপি কি এরূপ এক সত্তা (আল্লাহ্) মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?) তখন তিনি বল্লেন, **সুবহানাকা**- হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র। আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। জানতে চাওয়া হলে তিনি ব্যাখ্যায় বলেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাহ্)।

♦ যে ব্যক্তি সুরাতুল ক্বিয়ামাহ্ পড়ে আর শেষ আয়াত **আলায়সা যালিকা বি ক্বাদিরিন 'আলা আঁইউহিয়াল মাওতা** পর্যন্ত পৌঁছে সে যেন বলে **'বালা'** অর্থাৎ কেন নয় (আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান)।

♦ আর যে ব্যক্তি সুরাতুল মুরসালাত পড়ে ও শেষ আয়াত **ফাবিআয়্যি হাদীসিন বা'দাহূ ইউ'মিনূন** (অর্থাৎ অতএব এর পরে সে কোন কথার ওপরে ঈমান আনবে) পর্যন্ত পৌঁছে সে যেন বলে **আমান্না বিল্লাহি**- আমরা আল্লাহ্‌র ওপরে ঈমান এনেছি (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত)।

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন আব্বাস বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন সূরাতুল আ'লা-এর এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন **সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা** (অর্থাৎ তুমি তোমার মহামহিম প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো) তখন জবাবে এ বাক্যটি করতেন- **সুবহানা রব্বিয়াল আলা** (অর্থাৎ পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী (আবূ দাউদ, কিতাবুস্, সলাত)।

♦ হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরাতুত্তিন এর শেষ **আলায়সাল্লাহু বি আহ্কামিল হাকিমীন** (অর্থাৎ আল্লাহ্ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন) আয়াত পড়ে তখন পড়েন-**বালা ওয়া আনা 'আলা যালিকা মিনাশ্শাহিদীন**-অর্থাৎ কেন নয়, আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আর আমি এর সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত)।

♦ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, সূরাতুন্নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পরে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সব নামাযে যাতে **ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু** (অর্থাৎ সুতরাং তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো) পড়তেন তাতে কুরআনী নির্দেশ পালনার্থে এ দোয়া পড়তেন ঃ **সুবহানাকা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা- ল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী** অর্থাৎ আর তোমার প্রশংসার সাথে তুমি হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক পবিত্র হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

সূরাতুন্নাসর-এর শেষে জবাবে এ দোয়া পড়া উম্মতের একটি রীতি।

তিলাওয়াতের সিজদাহ্তে দোয়া

♦ কুরআন করীমের যেসব আয়াতে সিজদাহ্ আসে ওগুলো তিলাওয়াতের সময় সিজদাহ্ করা আবশ্যক। এর জন্যে ওযূ করা বা কিবলা মুখী হওয়া জরুরী নয়। সিজদাহ্-এর মধ্যে নিয়মিত তসবীহ্ ছাড়াও এসব দোয়াও বারবার পাঠ করা আহাদীস থেকে প্রমাণিত।

১। **সাজাদা ওয়াজহি লিল্লাযী খলাক্বহূ ওয়া শাক্কা সাম'আহূ ওয়া বাসারাহূ বিহাওলিহী ওয়া কুওওয়াতিহী** (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)। অর্থ ঃ আমার মুখমন্ডল সিজদাহ্তে পড়ে আছে সেই সত্তার সামনে যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন, আর নিজের বিশেষ শক্তি ও মহিমায় উহাকে শুনার ও দেখার সামর্থ্য দিয়েছেন।

২। **আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা 'ইনদাকা আজরান ওয়ায' 'আন্নী বিহা বিযরান ওয়াজআলহা লী 'ইনদাকা যুখরান ওয়া তাক্কাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্কাব্বালতাহা মিন 'আবদিকা দাউদ** (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার জন্যে এ সিজদাহ্-এর মাধ্যমে তোমার নিকট থেকে প্রতিদান লিখে নাও আর আমার নিকট থেকে এ বোঝা উঠিয়ে নাও এবং আমার জন্যে তোমার নিকট (পুণ্যের) তুলাদন্ড বানাও আর আমার থেকে এ সিজদাহ্ কবুল করো যেভাবে তুমি (তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে কবুল করেছো। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত

রসূল (সঃ)-এর খাদেম হযরত জা'ফর (রাঃ) বিন আবী তালীব

মুল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ

(শেষ কিস্তি)

মদীনায় আসার পর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত মুআয বিন জাবাল আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আর অভিজ্ঞতার আধিক্যের কারণে হযরত জা'ফর রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরামর্শদাতা ও মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত আলী (সঃ) বলতেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক নবীকে কিছু সম্মানিত সাথী দান করে থাকেন আর আমাদের ১৪ জন এমন সাথী দান করেছেন যে, এদের মধ্যে তিনি হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর নামও নিলেন যে, তিনিও আমার সম্মানিত মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৮, মিশরী ছাপা)। কিন্তু ঐশী নিয়তিতে হযরত জা'ফর-এর জন্যে এথেকেও বড় মর্যাদা অর্থাৎ শাহাদতের মর্যাদা নির্ধারিত ছিলো। আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছেন এক বছরও হয় নি। রোমান সীমান্তে গাস্সানী রাজ্যের সর্দার সারজিল বিন আমর মুসলিম দূত যিনি বসরার শাসনকর্তার নিকট রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাকে হত্যা করে ফেলে। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেয়।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইসলামী সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিন হাজার সৈন্য প্রস্তুত হয়। তখন তাদের আমীর নিযুক্তির বিষয় উঠলো। এ সেনাবাহিনীতে বুযূর্গ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন রওয়াহা আনসারী, বিখ্যাত সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ছাড়াও হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ও বিশেষ পরামর্শদাতা হযরত জা'ফর বিন আবী তালিব (রাঃ) ছিলেন, যিনি ইথিওপিয়ার বাদশাহের দরবারেও ইসলামী দলের মর্যাদাপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পারিবারিক মর্যাদার অধিকারীও ছিলেন। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেখানে তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে অধিক শানদার করতে চেয়েছিলেন সেখানে বিশেষ ও সাধারণ লোকদেরকে মানবীয় মর্যাদার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে আরও কয়েকটি প্রজ্ঞা দৃষ্টিপটে রেখে তিনি তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে এ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন ও হযরত জা'ফর (রাঃ)-কে দ্বিতীয় আমীর (Second in command) নিযুক্ত করতে গিয়ে বলেন, যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) শহীদ হয়ে গেলে পরে জা'ফর সেনাপতি হবে আর তার পরে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রাঃ) এমারতের নিশান বহন করবেন। হযরত জা'ফর পরম আনুগত্য দেখাতে গিয়ে এ সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন তবে কেবল এতটুকু বল্লেন, হে আল্লাহ্ নবী! আমার মা-বাবা আপনার উদ্দেশ্যে কুরবান হোন! আমার ওপরে যায়েদ (রাঃ)-কে আমীর বানাবেন এ ধারণাই আমার ছিলো না। তিনি (সঃ) বল্লেন, খোদার নামে রওয়ানা হয়ে যাও। কী ভাল তার তোমরা কী জানো? (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

সেনাবাহিনী রওয়ানা হয়ে গেলো। আর মূতা নামক স্থানে এক লক্ষ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলো। এতে তিনজন সেনাপতিই একে একে শহীদ হয়ে গেলেন। এবং পরিশেষে যথাসময়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) নেতৃত্ব শামলিয়ে নেন। ঐ দিন আল্লাহ্তাআলা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এ সেনাবাহিনীর সারাটা অবস্থা জানিয়ে দেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)।

তিনি মদীনাবাসীদের একত্র করার জন্যে সংবাদ পাঠালেন। পরে তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন।

তিনি (সঃ) এ কাশ্ফী দৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে, যাতে তাকে মূতার যুদ্ধের গোটা দৃশ্য দেখানো হয়েছিলো বলেন, খুবই একটি কষ্টদায়ক সংবাদ এসেছে। আমি কি তোমাদেরকে এ যুদ্ধে গমনকারী তোমাদের সেনাবাহিনী সম্বন্ধে সংবাদ দেবো? ঐ সেনাবাহিনী যুদ্ধের মাঠে শত্রুদের সাথে খুবই মোকাবেলা করেছে। আর সর্বপ্রথম সেনাপতি হযরত যায়েদ (রাঃ) শহীদ হয়ে যান। তোমরা সকলে তার ক্ষমার জন্যে দোয়া করো। এরপর সাহাবারা তাঁর ক্ষমার জন্যে দোয়া করেন। তিনি (সঃ) বলেন, পরে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হযরত জা'ফর বিন আবী তালিব শামলিয়ে নেন এবং শত্রুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর এভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। আমি তাঁর মহান শাহাদতের সাক্ষ্য দিচ্ছি। অতএব তাঁর ক্ষমার জন্যে দোয়া করো তখন রসূল (সঃ)-এর সমস্ত সাহাবা হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া করলেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৯, মিশরী ছাপা)।

মূতার যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী ও নেতৃবৃন্দের শাহাদতের ফলে যে অবস্থা দৃষ্টির সম্মুখে চলে আসে এতদ্দ্বারা আমাদের প্রভু ও নেতার সিদ্ধান্তের প্রজ্ঞাও সমানে পরিদৃষ্ট হয়। এ যুদ্ধের জন্যে প্রথম বার তিনি ধারাবাহিকতার সাথে তিন জন নেতার নিযুক্তি দেন। পরে মূতার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা মুজাহেদীনের বিস্তারিত বর্ণনা মোতাবেক রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এসব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনাকৃত সংবাদকে সমর্থন ও সত্যায়ন করে। সুতরাং বনী মরাহ্ বিন আওফ গোত্রের এক ব্যক্তি ওবায়েদ-এর পিতা আব্দুল্লাহ্ মূতার যুদ্ধে যোগদান করছিলেন। তিনি হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর শাহাদতের সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, খোদার কসম! হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর বীরত্বের দৃশ্যাবলী এখনও আমার চোখের সামনে রয়েছে। যখন তিনি টকটকে লাল ঘোড়ার ওপর থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়লেন এবং তলওয়ারের একটিই কোপে তার দফা রফা করে শত্রুর ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন আর ফিরে আসলেন না, এমন কি শহীদ হয়ে গেলেন (আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)। এভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা মতেও জানা যায় যে, হযরত জা'ফর (রাঃ) কী রকম নির্ভয়ে বীরত্বের সাথে শাহাদত লাভ করেন।

তিনি বলেন, যুদ্ধের পরে মূতার যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা আমাদের আমীর হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর লাশ খুঁজি। তখন অন্যান্য শহীদের মাঝে তাঁর লাশ এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাঁর দেহে তরবারী ও লেজার সত্তরটিরও অধিক আঘাত ছিলো। আর এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি আঘাতও পিঠে ছিলো না। মুসলমানদের এ সাহসী জেনারেল প্রত্যেকটি অস্ত্র তাঁর বুকে নিয়ে নিয়েছিলেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)।

আর এভাবেই একজন সৈনিক হিসেবে নেতার দায়িত্ব পালন করে দেখিয়েছিলেন। এভাবে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঐ কথাও পূর্ণ হয় যা তিনি তাঁকে আমীর ও নেতা নিযুক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন, কে জানে যে, কার নেতৃত্ব কোথায় সমীচীন?

হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (সঃ)-এর ভালবাসার সম্পর্ক ও তার আত্ম-বিলীনতার উদ্দীপনাকে মর্যাদা দানের অনুমান এসব ঘটনা থেকে সুপ্রকাশিত হয়, যা তিনি তাঁর পরিবারবর্গের সাথে হুযূর (সঃ)-এর আদর স্নেহের আকারে প্রকাশিত হয়। তিনি (সঃ) স্বয়ং সশরীরে হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে তাঁর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে দেন। হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর বিধবা স্ত্রী আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস-এর বর্ণনা অনুযায়ী যখন হযরত জা'ফর (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের শাহাদতের সংবাদ পৌঁছলো তখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে আসলেন। আমি ঘরের কাজ-কর্ম, আটা প্রভৃতি মাখার পরে ছেলে-পেলেদের গোছল ইত্যাদি করিয়ে অবসর হয়েছিলাম। হযরত রসূল করীম (সঃ) বল্লেন, হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর ছেলে-মেয়েদের আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি ছেলে-মেয়েদেরকে হুযূর (সঃ)-এর কাছে নিয়ে আসি। তিনি তাদের সাথে কোলাকুলি করলেন। আদর করলেন। তাঁর (সঃ) চোখে পানির বান ডাকলো। আসমা (রাঃ) বলেন, আমি বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)! আমার মা-বাবা আপনার উদ্দেশ্যে কুরবান হোক! আপনি কাঁদছেন কেন? হযরত জা'ফর (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে কি কোন সংবাদ এসেছে? তিনি (সঃ) বল্লেন, হ্যাঁ, আজ সে শহীদ হয়ে গেছে। আসমা (রাঃ) বলেছেন, আমি এ ভয়ানক খবর শুনে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। অন্যান্য মহিলারাও দুঃখ প্রকাশের জন্যে আমাদের ঘরে একত্র হলেন। রসূলে করীম (সঃ) নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। আর হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর পরিবারের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। খাবার ইত্যাদি তৈরী করে তাঁর ঘরে পাঠাতে বললেন কেননা, তাঁরা এ দুঃখের কারণে খুবই বিচলিত (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭২, মিশরী ছাপা)।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রিয় চাচাতো ভাই ৪০ বছর বয়স্ক হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর যুবক বয়সের মৃত্যুর দুঃসহ খুবই দুঃবহ ছিলো আর আমাদের প্রভু ও নেতা (সঃ) সবচে' অধিক মর্মাহত ছিলেন কেননা, তাকে তিনি (সঃ) খুবই স্নেহ করতেন। তিনি (সঃ) পূর্ণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের দৃষ্টান্ত দেখালেন এবং নিজের সাহাবীদেরকে বললেন, তাঁর যে শাহাদতের মর্যাদা লাভ হয়েছে এর ভিত্তিতে স্বয়ং তাঁরও আমাদের নিকট মজুদ থাকার চেয়ে অধিক ঐ উচ্চতর মর্যাদা প্রাপ্তির আনন্দ লাভ হয়েছে (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)।

এ প্রেক্ষাপটে মদীনাতে এর ওপরে মাতমের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা সাধ্যের সীমা পর্যন্তই রুখতে পারা যেতো। সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মূতার যুদ্ধের শহীদগণের সংবাদ পাওয়ার পরে স্বয়ং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মজলিসে আসলেন। তখন তাঁর চেহারায় শোক-দুঃখের ছায়া সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল। এক ব্যক্তি এসে জা'ফর (রাঃ) পরিবারের মেয়েদের মাতম প্রকাশের অভিযোগ তুলেন। হুযূর (সঃ) স্বয়ং ঐ কাতরতার অবস্থা দেখেই এসেছেন, এখন জোর করে তো আর

মহিলাদের থামানো যেতে পারতো না। কেবল উপদেশ ও নির্দেশই দেয়া যেতে পারতো। সুতরাং তিনি (সঃ) ঐ ব্যক্তিকেও এটাই বুঝালেন যে, সেখানে গিয়ে ঐ মহিলাদেরকে বুঝাও যেন মাতম করা থেকে বিরত থাকে। তিনি চলে গেলেন এবং কিছু সময় বাদে পুনরায় ফিরে আসলেন আর বল্লেন, তাদেরকে থামানো তো হয়েছিলো কিন্তু তারা কথা মানছে না। হুযূর (সঃ) তো নিজেই কঠিন দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন। তিনি (সঃ) পুনরায় বল্লেন, যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে পুনরায় তাদের গিয়ে বুঝাও। তিনি গেলেন, কিছু সময় পরে এসে আবার বলতে লাগলেন, তারা কোনক্রমেই বিরত হচ্ছে না। তিনি (সঃ) রাগের সাথে বল্লেন, তুমি তাহলে তাদের মুখে মাটি পুরে দাও। অর্থাৎ তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেছিলেন, আমি এ সবটা দৃশ্য দেখে মনে মনে বলেছিলাম, এ লোকটি আশ্চর্য ধরনের। মেয়েদেরকেও বুঝাতে পারছে না আর হুযূর (সঃ)-এর শোকের বোঝাকে ভারী করে তাঁকে কষ্ট দেয়া থেকেও বিরত হচ্ছে না (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)।

যা-ই হোক নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর পরিবারের আবেগের প্রতি যথাযোগ্য খেয়াল রেখেছেন। আর যে মাতম ও কাতরতার অবস্থা তাদের মাঝে দেখা যাচ্ছিলো তাতে তিনি কিছুটা ছাড়ও দিলেন। তৃতীয় দিন তিনি (সঃ) পুনরায় হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন আর বল্লেন, এরপর থেকে আপনারা আমার ভাইয়ের জন্যে কান্না-কাটি করবেন না। পরে তার এতীম শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থাও নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন। আর বলেন, আমার ভাইয়ের ছেলেকে আমার নিকট নিয়ে এসো। হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র বর্ণনা আছে যে, আমাদেরকে হুযূর (সঃ)-এর নিকট এমনভাবে নিয়ে আসা হলো যে, যেভাবে মুরগীর বাচ্চাকে ধরে নিয়ে আসা হয়। তিনি (সঃ) নাপিত ডাকালেন আমাদের চুল ইত্যাদি কাটালেন আমাদের প্রস্তুত করালেন। খুবই ভালবাসা ও স্নেহের ব্যবহার করলেন এবং বলতে লাগলেন, জা'ফর তাইয়ার-এর পুত্র মুহাম্মদকে তো আমাদের চাচা আবূ তালিবের মতই মনে হয়, আর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ্‌ চেহারা তার পিতার মত আর রূপে ঢঙ্গে আমার সাথে সাদৃশ্য রাখে। আবার আমার হাত ধরেন আর যেন খোদাতাআলার নিকট সোপর্দ করতে গিয়ে অন্তরের ব্যথা নিয়ে এ দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ্‌! জা'ফরের পরিবার-পরিজনের স্বয়ং হাফেয ও নাসের হও আর আমার (আব্দুল্লাহ্‌) ব্যবসায়ের জন্যেও দোয়া করেন।

আমাদের মা আসমা (রাঃ) এসে আমাদের এতীম হওয়া সম্বন্ধে বল্লে, তিনি (সঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দেন ও বলেন, এ ছেলে-পেলেদের দারিদ্র ও অভাব-অনটনের চিন্তা করবে না। আমি এ দুনিয়াতেই কেবল তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত নই বরং পরকালেও তাদের বন্ধু ও অভিভাবক হবো (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪, মিশরী ছাপা)।

নবী করীম (সঃ) যে নিজের পবিত্র চরিত্র ও স্বভাবের ন্যায় হযরত জা'ফরের সাদৃশ্য বর্ণনা করলেন এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হলো হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর মানবের প্রতি সহানুভূতি ও সৃষ্টির সেবায় পরিদৃষ্ট হয়। ধারণা করা হয়, ভিটে-মাটি ছাড়ার কারণে ও ভ্রমণকারীর জগতে দুঃখ-কষ্ট তাঁর চরিত্রে আরও চমক সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। সুতরাং হযরত জা'ফর দরিদ্র ও অভাবীদের খুব ভালবাসতেন। তাদের প্রয়োজনের দিকেই কেবল খেয়াল রাখতেন না বরং তাদের আবেগানুভূতির প্রতিও দৃষ্টি দিতেন। তাদের সভা-সম্মেলনে যেতেন। তাদের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হতেন। মোট কথা তার এ চরিত্র এমনই সুস্পষ্ট ছিলো যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর ডাক নাম তাঁর ছেলেদের পরিবর্তে গরীবদের তুলনায় আবূ মাসাকীন- গরীবের বাপ রেখে দিলেন (আল্ আসাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৮)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) খয়বরের বিজয়ের কালে ইয়ামেন থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন আর এসব গরীব ও দরিদ্র সাথী 'আসহাবে সুফফা'দের অন্তর্ভুক্ত হন। এঁরা ধর্মের শিক্ষা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে মসজিদে নবুবীকে আঁকড়ে থাকতেন। হযরত জা'ফরের এ দরিদ্রদের প্রতি কতটা দৃষ্টি থাকতো তার অনুমান এক অভাবী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর নিজের ঘটনা থেকে অনায়াসে আঁচ করা যেতে পারে। তিনি বর্ণনা করেন, এসব দিনে আমি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত সত্ত্বেও রসূল (সঃ)-এর পিছু ছাড়তাম না। অভুক্ত ও পিপাসায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও খালি পেটে পাথরের ওপরে উপুর হয়ে শুয়ে থেকে এ কষ্টকে লাঘব করার চেষ্টা করতাম। আর কখনও কখনও রসূল (সঃ) কোন সাহাবীর সাথে বিশেষ কোন আয়াত প্রসঙ্গে জানতে চাইতাম (যা গরীবের খাবার খাওয়ানোর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো), যদিও সেটা আমার জানা থাকতো। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হতো সুন্দর কায়দায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সম্ভবতঃ এভাবে সে আমাকে খাবার খাইয়ে দেবে। কিন্তু আমি দেখেছি, গরীবদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সকলের চেয়ে উত্তম যদি কেউ থাকতো তাহলে তা হযরত জা'ফর (রাঃ)। তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতেন। ঘরে যা-ই থাকতো তিনি আমাকে খাইয়ে দিতেন। এমন কি কখনও কখনও চামড়ার তৈরী ঐ ধরনের বাসন যাতে মধু বা ঘি থাকতো তা উঠিয়ে নিয়ে আসতেন আর আমরা খিদেয় আক্রান্ত উহাকে চিড়ে ফেরে তার মধ্যে যা কিছু থাকতো তা সব চেটে চুষে খেয়ে নিতাম (বুখারী, কিতাবুল মানাক্বিব, জা'ফর অধ্যায়)।

সম্ভবতঃ এ কারণেই আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) প্রকাশ্যে নিজের এ মতামত প্রকাশ করতেন যে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে হযরত জা'ফর ত্বায়ার (রাঃ) থেকে উৎকৃষ্ট ও উত্তম মানুষ আমরা কাউকে দেখি নি (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাক্বিব)।

নবী (সঃ)-এর দরবারের কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ) হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর শাহাদত উপলক্ষ্যে শোক গাঁথা বলতে গিয়ে কতইনা সুন্দর লিখেছেন!

আমরা হযরত জা'ফর ত্বায়ার (রাঃ)-এর দৃষ্টান্তে বিশ্বস্ততার মহান উদাহরণ দেখতে পাই। যেখানেই যে আদেশ পেয়েছেন সাথে সাথে অবনত মস্তকে তা পালন করেছেন। আর হাশেম পরিবার তো সব সময়েই সম্মানের শীর্ষে পরিণত হয়ে গর্বের সাথে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন (আল্ আসাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, জা'ফর বিন আবী তালিবের বর্ণনায়)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এসব প্রাচীন বুযূর্গদের উত্তম গুণাবলী ও কৃতিত্বকে জীবিত রাখার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন, তা-ই যেন হয়।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ জনাব নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(১০ম কিস্তি)

সূরাতুল বাকারাহ্-২

১১৫। ওয়া মান আযলামু মিম্মান মানা'আ
আর কে বড় জালিম ঐ ব্যক্তি থেকে যে নিষেধ করে

মাসাজিদা আল্লাহি আঁইউযকারা ফীহা ইসমুহূ ওয়া
আল্লাহ্‌র মসজিদ যেন তাতে স্মরণ করা যায় তাঁর নাম আর

সা'আ খারাবিহা উলাইকা মান কানা লাহুম
চেষ্টা করেছে উহাকে বিরান করার এরাই তারা তাদের জন্যে সমীচীন ছিলো না

আঁইয়াদখুলূহা ইল্লা খাইফীনা লাহুম
যেন তাতে প্রবেশ করে ভয় করা ছাড়া, তাদের জন্যে রয়েছে

ফিদ্দুনয়া খিযইউন ওয়ালাহুম ফিল আখিরাতি
ইহকালে লাঞ্ছনা আর তাদের জন্য পরকালে

'আযাবুন 'আযীম ১১৬। ওয়া লিল্লাহি আল্ মাশরিক
মহা শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র জন্য পূর্ব

ওয়াল মাগরিব ফাআয়নামা তুওয়াল্লু ফাসাম্মা
ও পশ্চিম অতএব যে দিকে মুখ তোমরা করো তাহলে সেদিকেই

ওয়াজহুল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা ওয়াসি'উন 'আলীম ১১৭। ওয়াক্বালূ
আল্লাহ্‌র মুখ বা নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ আর তারা বলে

মনোনিবেশ,

আত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদান সুবহানাহূ বাল্‌লাহূ
আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন এক পুত্র তিনি পবিত্র, (না) বরং তাঁর

মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি
যা আছে আকাশ সমূহে আর পৃথিবীতে

কুল্লুল্লাহূ ক্বানিতূন ১১৮। বাদীউস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি
সব তাঁরই অনুগত আকাশসমূহের সৃষ্টির সূচনাকারী এবং পৃথিবী

ওয়া ইযা কাযা আমরান
এবং যখন সিদ্ধান্ত নেন কোন বিষয়ে

ফাইন্নামা ইয়াকূলু লাহূ কুন ফাইয়াকূন
তখন কেবল তিনি বলেন তাকে হয়ে যাও তখন তা হয়ে যায়

১১৯। ওয়া ক্বালা আল্লাযীনা লা ইয়া'লামূনা লাওলা
এবং বলে তারা যারা জ্ঞান রাখে না কেন না

ইউকাল্লিমুনাল্লাহু আও তা'তীনা আয়াতান কাযালিকা
আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে এভাবেই

ক্বালা আল্লাযীনা মিন ক্ববলিহিম মিসলা ক্বওলিহিম
বলে ছিলো তারা যারা তাদের পূর্বে ছিলো অনুরূপ তাদের কথার

তাশাবাহাত কুলূবুহুম ক্বদ বায়্যান্না আল্ আয়াত
একই রূপ হয়ে গেছে তাদের অন্তর, নিশ্চয় সুস্পষ্টভাবে আয়াতসমূহ
আমরা বর্ণনা করেছি

লিক্বওমিন ইউক্বিনূন ১২০। ইন্না আরসালনাকা
ঐসব লোকদের জন্যে যারা দৃঢ়-বিশ্বাস রাখে নিশ্চয় আমাকে তোমাকে পাঠিয়েছি

বিল হাক্কি বাশীরান ওয়া নাযীরান ওয়ালা তুসরালূ
সত্যতার সাথে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না

আন আসহাবিল জাহীম ১২১। ওয়ালান তারযা আনকা
দোযখ বাসীদের প্রসঙ্গে আর কখনও সন্তুষ্ট হবে না তোমার ওপরে

আল্ ইয়াহূদু ওয়ালান্ নাসারা হাত্তা তাত্তাবি'আ
ইহুদীরা এবং খৃষ্টানরাও না এমন কি অনুসরণ করো তুমি

মিল্লাতাহুম কুল ইন্না হুদাল্লাযি হুয়াল হুদা
তাদের ধর্মাদর্শ, তুমি বলে দাও নিশ্চয় আল্লাহ্‌র আসল হেদায়াত
হেদায়াতই

ওয়া লাইনি আত্তাবা'তা আহ্ওয়ায়াহুম বা'দা
আর নিশ্চয় যদি তুমি অনুসরণ করো তাদের খেয়াল খুশীর পরে

আল্লাযী জায়াকা মিনাল'ইলম মালাকা মিনাল্লাহি
তার যা তোমার নিকট এসেছে জ্ঞান তোমার জন্যে হবে না আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে

ওয়ালীইন ওয়ালানাসীর ১২২। আল্লাযীনা আতায়নাহুম
বন্ধু ও সাহায্যকারী নয় তারা যারা আমরা তাদেরকে দিয়েছি

আল্ কিতাব ইয়াতলুনাহূ হাক্কা তিলাওয়াতিহী উলাইকা
কিতাব তা পড়ে যথাযথভাবে তার পড়া এরাই

ইউ'মিনূন বিহী ওয়া মাঁইয়াকফুরবিহী ফাউলাইকা
ঈমান আনে এর ওপরে, আর যে একে অস্বীকার করবে সেক্ষেত্রে এরাই

হুমুল খাসিরান ১২৩। ইয়াবানী ইসরাঈলা উযকুরূ
তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ করো

নি'মাতিয়াল্লাতি আনআমতু 'আলায়কুম ওয়া ইন্নী
আমার নেয়ামত যা আমি নেয়ামত দিয়েছি তোমাদেরকে এবং নিশ্চয় আমি

ফায্যালতুকুম 'আলাল 'আলামীন ১২৪। ওয়াত্তাকূ ইয়াওমান
তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম বিশ্ব-জগতে এবং তোমরা ভয় করো সে দিনকে

লা তাজযী নাফসুন আন্‌নাফসীন শায়আন ওয়ালা
কাজে আসবে না কোন আত্মার কোন আত্মা থেকে কোন কিছুও আর না

ইউকবালু মিনহা আদলুন ওয়ালা তানফা'উহা শাফা'আতুন
গ্রহণ করা হবে তাথেকে মুক্তিপণ এবং না তাকে কাজ দেবে সুপারিশ

ওয়া লাহুম ইউনসারূন ১২৫। ওয়া ইযিবতালাইব্‌রাহীমা
এবং না তাদের সাহায্য করা হবে এবং যখন ইব্রাহীমকে পরীক্ষা করলেন

রব্বুহূ বিকালিমাতিন ফাআতাম্মাহুন্না ক্বালা
তার প্রভু-প্রতিপালক কয়েকটি কথা দিয়ে সুতরাং সে সেগুলোকে পূর্ণ করলো তিনি বললেন

ইন্নী জা'ইলুকা লিন্নাসি ইমামান ক্বালা
নিশ্চয় আমি তোমাকে বানাবো মানুষের জন্যে ইমাম বা নেতা, সে বললো

ওয়া মিন যুর্‌রিয়্যাতি ক্বালা লা ইনালু 'আহদী
আর আমার বংশধর থেকেও তিনি বল্লেন পৌছবে না আমার অঙ্গীকার

আয্‌যলিমীন ১২৬। ওয়া ইয্ জা'আলনা আল্ বায়তা
জালিমদের কাছে এবং (স্মরণ করো) যখন আমরা করেছিলাম (কা'বা) ঘরকে

মাসাবাতাল্লিন্নাসি ওয়া আমনান ওয়াত্তাখিযূ
একত্র হওয়ার স্থান মানুষের জন্যে এবং নিরাপদ, আর তোমরা বানাও

মিম্ মাক্বামি ইব্‌রাহীমা মুসাল্লা ওয়া 'আহিদনা
মর্যাদা ইব্রাহীমের নামাযের স্থান, আর আমরা নির্দেশ দিয়েছি।

ইলা ইব্রাহীমা ওয়া ইসমাঈলা আন্‌ত্বহ্‌হিরা বায়তিয়া
ইব্রাহীমকে এবং ইসমাঈলকে যে, পরিষ্কার রাখে আমার ঘরকে

লিত্বায়িফীনা ওয়াল 'আকিফীনা ওয়ারুক্কাইস্‌সুজূদি
তাওয়াফ (প্রদক্ষীন) ও ই'তিকাফকারীদের, রুকূকারীদের ও
সিজদাহকারীদের জন্য

১২৭। ওয়া ইয্ ক্বালা ইব্রাহীমু রাব্বিজ'আল হাযাল বালাদান
এবং (স্মরণ করো) যখন ইব্রাহীম হে আমার প্রভু- একে শহর
বলেছিলো প্রতিপালক বানাও

আমিনান ওয়ারযুক্ব আহ্‌লাহূ মিনাস্‌সামারাতি মান
নিরাপদ আর রিযক দাও এর অধিবাসীদেরকে ফল-ফলাদি থেকে যারা

আমানা মিনহুম বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ক্বালা
তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌তে ও আখিরাতের দিনে তিনি বললেন
ঈমান এনেছে

ওয়া মান কাফারা ফাউমাত্তি'উহূ ক্বলীলান সুম্মা
আর যারা অস্বীকার করেছে তবে তাকে কিছুটা এরপর
কল্যাণ পৌছাবো

আয্‌ত্বররুহূ ইলা আযাবিন্‌নার ওয়া বি'সাল্‌মাসীর
তাকে বাধ্য করবো আগুনের শাস্তির দিকে, এবং কতইনা মন্দ ফিরে যাওয়ার জায়গা

ওয়া ইয্ ইয়ার ফা'উ ইব্রাহীমু আল ক্বওয়া'ইদা
আর (স্মরণ করো) যখন উঁচু করছিলো ইব্রাহীম ভিত্তি সমূহ

মিনাল বায়তি ওয়া ইসমাঈলু রব্বানা
কা'বা ঘরের ও ইসমাঈল হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক

তাক্বব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতা আস্‌সামী'উন 'আলীম
আমাদের কাছ থেকে নিশ্চয় তুমিই সর্ব শ্রোতা সর্বজ্ঞ।
গ্রহণ করো

(চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বড় নবীর ছোট ছোট শিক্ষা

ক্ষুদ্র একটি নৌকা করে মহাসাগর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করা যেসব এক বিবেকহীন মস্তিষ্কের কাজ তেমনিভাবে ধর্ম জগতের উজ্জ্বল রবি নবী আকরম (সঃ)-এর জীবন-বৈশিষ্ট্য জানাতে শেষ করার চিন্তা করাও এক নীরেট বোকামীর কাজ। কেননা সেই পুণ্যবান পুরুষের জীবন শাখার প্রতিটি অধ্যায়েরই কেবল শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। জানার পথ আছে কিন্তু তার সীমা নেই। তাই সেই জানাকে সমাপ্ত করার মত সাধ্যও কারো নেই। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, ক্ষুদ্র নৌকা করে সাগর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করার ব্যাপারে বাধা আছে বৈকি কিন্তু সেই নবী জীবনকে পূর্ণভাবে জানার ব্যাকুলতায় কোন প্রকারের কোন বাধা নেই বরং তা অধিকতর পুণ্যের কাজ। একাজে যে যত অধিক অগ্রসরমান সে আধ্যাত্মিকতায় তত বেশী সফলকাম। সুতরাং আমি এখন সেই লোভেই অনুরূপ কাজের চেষ্টায় কলম চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পাপী তাপী কিংবা পুণ্যবান যে কোন জনই পানিতে ডুব দিয়ে ক্ষণিকের মধ্যেই যেমন শরীরকে সিক্ত করে নিতে পারে, তেমনিভাবে তাদের প্রত্যেকেই সেই নবী-শ্রেষ্ঠ-এর এই জীবন সরোবরে ডুব দিয়ে কিছু না কিছু পুণ্যধন কুড়িয়ে নিতে পারে। তবে সেই অর্জন নির্ভর করবে ডুব দেয়া ঐ ব্যক্তির আত্মার পবিত্রতা ও তার কর্ম-চরিত্রের উপর। নবীজীর শিক্ষা ও তাঁর পুণ্যময় আদর্শ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যে ব্যক্তি যত বেশি রঙ্গিন হ'তে পারবে সে খোদার তত বেশী দিদার ও ভালবাসা লাভে সমর্থ হবে। বলতে কি কেবল এ কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই আজ সমাজ ও পারিবারিক জীবনে শান্তি ও নিয়ম - শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্যথায় নয়। একথা নিতান্তই সত্য যে, বিগত দিনে জগৎ তার বাহুবলে বহুভাবে চেষ্টা করেছে তার বুকে কাংখিত সেই শান্তি ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু তা ঐ চিহ্নিত পথে নয় বিধায় তাদের সেই চেষ্টা ও প্রচেষ্টা আজ বিফল হয়েছে পরিপূর্ণভাবে। প্রতিটি দেশের প্রতিটি ঘটনাই এর বাস্তব সাক্ষী। কারণ **ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম** (আল্ কুরআন)। মানুষের জন্য প্রদত্ত এই পাথেয়কে বাদ দিয়ে মানুষ আর কখনও পথ চলতে সমর্থ হবে না। তার সকল শ্রম সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু বিশ্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তিত্বের ছোট ছোট উপদেশ দ্বারাই আমরা বিশ্বব্যাপী এত সব বড় বড় সমস্যাকে সমাধান করতে সক্ষম হতে পারি। যদি তা জগদ্বাসী সকলে সমভাবে পালন ও লালন করে চলে। এখন আমি সেই শিক্ষাগুলিরই দু' একটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। তাঁর ছোট ছোট নির্দেশনার মধ্যে একটি হলো রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা অন্যের জন্যও তা-ই পসন্দ করো যা তোমরা নিজেদের জন্য পসন্দ কর।' এই প্রসঙ্গে এখানে বলতে হয় যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবন চলার পথে কেউই ইহা চান না যে, তিনি নিজে কোন প্রকারের কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা কোনভাবে নির্যাতিত হন অথবা তার সংসার কিংবা কারবার প্রতিষ্ঠান অনুরূপ অসামাজিক কাজ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হোক। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা তা দেখতে পাচ্ছি? মোটেই তা নয়। বরং তা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে দেশে ও বিদেশে বিশ্বের সর্বত্রই এই সন্ত্রাসী অর্থাৎ অন্যের অহিত সাধন কর্ম নজীর বিহীনভাবে হরদম চলছে। এই অনুপম শিক্ষাকে মানুষ বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় একে অন্যের অহিত সাধন ক'রে চলছে বিরামহীনভাবে। যার ফলে আমাদের জীবন-জীবিকা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। জ্বালা যন্ত্রণায় প্রত্যেকেই কেমন যেন এক নির্বোধ প্রাণীর ন্যায় দিনপাত করছে, আর তা শুধু এ জন্যেই যে, আমরা আমাদের নিজের বেলায় যা পসন্দের বলে মনে করি, যা কল্যাণকর বলে চিন্তা করি তা অন্যের জন্য চিন্তা করি না। সব ক্ষেত্রেই নিজের কল্যাণ, নিজের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করি। নিজ দালানের ছাদের পানির দ্বারা অন্যের ঘরের ক্ষতি হোক তাতে কোন যায় আসে না। পারতপক্ষে এর প্রতিবাদ করারও সুযোগ দেয়া হবে না বরং নির্মম অত্যাচারে প্রতিবেশী বাসিন্দা নির্বিঘ্নে কেটে পড়ুক সেটাই ভাল। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতেও দেয়া হবে না। কারণ আমি দাম্ভিকতাসহ আমার মত বাঁচব এটাই আসল কথা। এতে করে অন্যেরা উচ্ছন্নে যাক তাতে কোন যায় আসে না। এ হলো চলতি জামানার মানুষের বাঁচার ভাবনা, যা মানব দরদী রসূল (সঃ)-এর আদর্শ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। যার কারণে আজ মানুষের সাথে মানুষের দৃষ্টান্তহীন সংঘাত এবং পৃথিবীর সর্বত্র কেবল লাশ আর লাশ। ইসলামের ছোট্ট একটি আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণেই মানুষের আজ এত বড় দুর্দশা। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

রসূলে করীম (সঃ)-এর অন্য আর একটি শিক্ষা হলো, তিনি তাঁর পবিত্র সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই বড় যোদ্ধা যে কিনা আপন নফসের সাথে যুদ্ধ করে"। উপদেশটি নেহায়েতই ছোট কিন্তু তার মাহাত্ম্যের গভীরতা অনেক বেশি। নিজের মর্যাদা নিজের পবিত্রতা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও তাকওয়ার গভীরতার পরিমাপ যার মাঝে নেই সে কখনও আদর্শবান বলে চিহ্নিত হতে পারে না। নেকীর পরিপন্থী রিপু যেমন, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ কামলোলুপ দৃষ্টি, পরচর্চা-জিঘাংসা, আত্মাহংকার, ঈর্ষা, অশিষ্টাচার আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি দুষ্টকর্ম অহরহ মানুষকে বিপর্যয়ের পথে টানছে এবং এসবের কুপ্রভাবের বশবর্তী হয়ে পরিশেষে মানুষ আজ তার গন্ডির চতুঃসীমা এমন সব নির্মম কর্ম করছে যা শুনে দেহ ও মন মৃত্যুভয়ে আঁৎকে উঠে। এর মূল কারণই হচ্ছে নফসে আম্মারা অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির কাছে মানুষের সর্বস্বান্ত পরাজয়। যার ফলে একটি ১৬ বছরের ছেলে একটি ১২ বছরের শিশুকে ১২টি টুকরায় খন্ড করতেও দ্বিধা করে না, কম্পিত হয় না (বয়স আরও বেশি হলে হয়ত আরও বেশি টুকরায় খন্ডিত করা হতো) বরং মেরে ফেলার পরও সে নির্দ্বিধায় মুক্তিপণ দাবী করছে এবং এজলাসে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় এই অপকর্মের বিবরণ দিচ্ছে। মানুষের অন্তরে বিরাজমান কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মানুষ বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত সে কখনও প্রকৃত যোদ্ধা তথা তাকওয়াশীল মানুষকে পরিণত হতে পারবে না। তার কারণেই সেই দুষ্ট সত্তার প্ররোচনায় মানুষ আজ নির্বিচারে অমানবীয় এমন সব কর্ম করে যাচ্ছে, যার চেহারা বন্য পশুর কর্মের চেয়েও অধিকতর নিকৃষ্ট। লুট, ব্যভিচার, অগ্নিসংযোগ পরস্বহরণ, এসিড নিক্ষেপ মামলা, বোমাহামলা, সম্ভ্রমহানি ইত্যাকার নীতিভ্রষ্ট দুর্নীতি কাজের অত্যাচারে সমাজের অবস্থা একেবারেই যাচ্ছে- তাই, ভয়ে যেন সব কম্পমান। আগে বলা হতো ছেলেমেয়েদের সাথে করে সিনেমা দেখার কোন পরিবেশ নেই, আর এখন বলা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের পেপার

পত্রিকা পড়ানোর আর পরিবেশ নেই। এই জঘন্যতম পরিণতির একমাত্র কারণ ইহাই যে, আমরা আমাদের দুষ্ট নফসের বিপরীতে যুদ্ধে জিতে আদর্শবান যোদ্ধা হ'তে পারি নি। তাই মানব সৃষ্টির এই সর্বনাশা পরাজয়। তবে এর শেষ কিন্তু এখানেই নয়। এসবের পরিণতি ভবিষ্যতে আরো ভয়ঙ্কর হবে যদি না আমরা তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং মুখ্য কথা এটাই যে, নসীহতটি যদিও ছোট কিন্তু তার আমলহীনতার কারণে মানুষের দুর্দশার পরিমাণ অনেক বড়। এর চরমত্ব যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা· আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অতএব এ কারণেই তাঁর প্রতিটি শিক্ষা নিয়ে আমাদের ভীষণভাবে ভাবা দরকার।

অতঃপর এখন আমরা মহানবী (সঃ)-এর আরো একটি শিক্ষা নিয়ে আলোকপাত করব, আর তা হলো, তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সে-ই প্রকৃত মু'মিন যার হাত ও জিহ্বা থেকে তার প্রতিবেশী অধিকতর নিরাপদ" পৃথিবীর এই সমাজ জীবনে আমরা পরস্পর পরস্পরের একান্ত আপন প্রতিবেশী আমি আমার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী, একটি গ্রাম পাশের গ্রামের একটি শহর পাশের শহরের এবং একটি দেশ পার্শ্ববর্তী দেশের আপন প্রতিবেশী। কিন্তু দুঃখের কথা ইহাই যে, এখানেও আমরা তাঁর শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করছি ও প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশি। মারামারি হানাহানী, কোর্ট কাচারী ইত্যাতার শান্তি বিঘ্নিত কলহ-ফাসাদ বর্তমানে প্রতিবেশীর সাথেই অধিকতর হিংস্র বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। পরিণামে প্রতিবেশীকে খুন করে কিংবা তার সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে হলেও তার প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু কুরআন বলে, "তোমরা কখনও লঘু অন্যায়ের জন্য গুরু দন্ড দিও না।" কিন্তু এখন প্রতিবেশীর কল্যাণার্থে সামান্যটুকু স্বার্থ ছাড় দিতে কিংবা তার প্রতি সহনশীল হতে কেউ রাজি নয়। তা ইসলাম অনুসারীই হউক আর অন্য কোন ধর্মাবলম্বীই হউক, সর্বত্রই এই চরিত্রের চিত্র বিদ্যমান। যার ফলে মানব সমাজে মানব-প্রেমের অস্তিত্ব একেবারেই নেই। সুতরাং সত্য এটাই যে, যেখানে এই মহানমানবের ক্ষুদ্রতম একটি শিক্ষাও অবজ্ঞা করা হবে সেখানেই মানুষ মহা বিপর্যয়ে পতিত হবে। এ ব্যাপারে আমাদের খোদা এতদিন খুব কঠিন ছিলেন না, বড়ই সহনশীল ছিলেন; কিন্তু এখন আর তিনি তেমন থাকবেন না বরং রুদ্র রোষে তিনি তাঁর সকল ইচ্ছা পূরণ করবেন।

রসূলে আকরম হযরত (সঃ)-এর আরো একটি অদ্বিতীয় শিক্ষা হলো, তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা সর্বক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।" এ ব্যাপারে তিনি তাঁর নীতিতে ছিলেন অটল। একবার কোন এক বিচারের রায় দিতে গিয়ে হুযূর (সঃ) বলেছিলেন, "আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি অনুরূপ দোষে দোষী হতো তবে তাকেও আমি সেরূপ দন্ডে দন্ডিত করতাম যেরূপ আমি আজ অন্যের বেলায় করেছি"। কিন্তু হায়! বড়ই অনুতাপ যে, বর্তমান সমাজের ন্যায়-নীতি, ন্যায়-বিচার ও ন্যায়-চিন্তার অভাব অত্যন্ত প্রকট। দুর্নীতি এখন নীতির কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। মিথ্যা শক্তির প্রভাবে সত্যাচারীকেই লুকিয়ে চলতে হচ্ছে, জুলুমবাজের জালে মজলুমকেই আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, নির্যাতিতগণ সৎ বিচারের প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিচ্ছে। ফলে কপটের কাছে সাধুগণ নিত্যই লাঞ্ছিত হচ্ছেন। যার কারণে সালাম-কালাম প্রদানের দায়ে নিষ্ঠাবান পুণ্যাত্মাগণকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। আর মসজিদগাহে নামাযেরত ইসলাম সেবকদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। কেবল তা-ই নয়, কোন এক যুদ্ধাবিলাসী রাষ্ট্র তার শক্তির অহংকারে নেহায়েৎ অন্যায়ভাবেই নিরীহ জনগণকে বেদমহারে সংহার করছে, যার প্রতিকারেরও কেউ নেই, প্রতিবাদেরও কেউ নেই। ধর্মজগতের সর্বশেষ সেই কল্যাণকর শিক্ষার অভাব হেতুই আজ পার্থিব জগতের দেশে দেশে জ্বলছে অ-সুখের এই আগুন এবং তা আরো ভয়ঙ্কর রূপে জ্বলতে থাকবে প্রতিটি দেশের প্রতিটি ঘরে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সেই পুণ্যময় শিক্ষাকে সুপ্রবৃত্তির মানদন্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। সুশিক্ষাকে বর্জন করে কুশিক্ষার নিরীখে সুশীল সমাজ গঠন করার চিন্তাকে কুচিন্তা বলাই শ্রেয়।

আঁ হযরত (সঃ) তথা ইসলামের আরো একটি শিক্ষা নিয়ে আরো একটু আলাপ করা যাক, আর তা হচ্ছে, তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা এমনসব কথা বলো না, যা তোমরা করো না"। কিন্তু বর্তমানে সমাজের চিত্র হলো এর উল্টোটা, শুধু মাত্র তা-ই বলা হয়, যা করা হয় না। অর্থাৎ যাকে বলা যায় ডাহা মিথ্যা কথা। যাবতীয় কর্মের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে নিজেকে নিরঙ্কুষ স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। বক্তব্যের মঞ্চে কথায় যে যত বড় বাগ্মিতায় যে যত পটু সে-ই তত বড় মহান তত বড় হিতৈষী এবং তত বড় নেতা, কর্ম তার যেমনই হউব না কিন্তু কবির কথা হলো ঃ

"আমার দেশে কবে সে ছেলে হবে
কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হবে"

ধিক, সেসব প্রবক্তাদের যারা সত্যের অপলাপ দ্বারা সত্যকে ধ্বংস করছে। মহানবী (সঃ)-এর পুণ্যাদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জালিয়াতী, হঠকারিতা, কুচিন্তা ও কুকর্ম দ্বারা সমাজকে নিদারুণভাবে কষ্ট দিচ্ছে, সাধু, সৎ ও
সরলমনাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। সমাজের ভাগ্য বিধাতা সেজে মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। হে আমাদের খোদা! আমাদের হয়ে তুমিই সেই প্রতারকদের বিচার করো। আমরা শক্তিহীনগণ তোমারই সাহায্য প্রার্থী। মূলতঃ রসূলে করীম (সঃ)-এর এই আদর্শ শিক্ষা অর্থাৎ ওয়াদা ভঙ্গ না করা, মুখে তা বলা যা মূলে করা হয়, এসব আদর্শগত শিক্ষার অবসান না করাই হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তাহীন জীবনের মূল কারণ, যার জন্য কেউ যায় মঞ্চে আর কেউ বা ছিনতাইকারী সন্দেহে দু'চারজনকে আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে, বলতে কি, বিড়াল কুকুর ছানারও একটি আশ্রয়স্থল আছে কিন্তু মানুষের বেলায় যেন তেমনটিও আজ আর নেই। কোন্ দিকে গেলে কোন্ বুদ্ধি বলে যে মানুষ এতটুকু শান্তির ছায়া পাবে তারও পথ আজ মানুষের কাছে অজানা। তাই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সাধক হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সকলকে আহ্বান করে বলেছেন, "হে লোক সকল! সে-ই প্রকৃত মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সমতুল্য আর কোন রসূল নাই এবং কুরআন ও এই রসূলের শিক্ষা ব্যতীত আর কোন শিক্ষা ও শিক্ষা গ্রন্থ নাই। সুতরাং তোমরা কেবলই সেই উৎসের পিয়াসী হও যাহা মানুষকে শান্তি দিতে সক্ষম। নিশ্চয় তাহা তোমাদের নিকট আগমন করিবে যদি তোমরা যোগ্য প্রত্যাশী হও। সেই দুগ্ধ প্রাপ্তির জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাক যেন তাহা স্বতঃই স্তন হ'তে নির্গত হইয়া আসে। তোমরা দয়ার যোগ্য পাত্র হও তবেই তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে" (কিশ্তিয়ে নূহ্)। মুদ্দা কথা যে, এ আহ্বানের অনুগামী হওয়া ছাড়া শান্তি ও মুক্তির সন্ধান পাওয়ার আর কোন বিকল্প পথই মানুষের জন্য খোলা নেই।

ইত্যবসরে আমি আমার বিষয়ের উপর বেশ কিছু কথা বলে ফেলেছি, সুতরাং আর বেশী দূর এগুতে চাই না, আমাদের প্রিয় রসূল (সঃ)-এর এমনতির হাজারো শিক্ষা রয়েছে যার সবগুলি নিয়ে আলোচনা করা কদাচ সম্ভব নয়। যদি বা চেষ্টা করি তবে তা প্রবন্ধ না হয়ে মস্ত বড় এক কিতাবে পরিণত হয়ে পড়বে। অতএব এ কারণেই আমি শুরুতে বলেছিলাম, এই মহান জীবনের প্রতিটি শাখারই কেবল শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আমি সেই মহৎ জীবনের শিক্ষার সীমাহীন সাগর থেকে কেবলমাত্র শিশির তুল্য কিঞ্চিত পরিমাণ সম্পদ চয়ন করে এনে তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। তাতে করে যদি কারোর ঘুমন্ত আত্মা প্রকৃত ধর্ম যাচ্ঞায় জাগ্রত হয় তবেই আমি সার্থক। রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতিটি বিন্দুবৎ শিক্ষায়ও সিন্ধুসম গভীরতা রয়েছে। কিন্তু দুনিয়া তাঁর সেসব শিক্ষার আলো থেকে বেমালুম দূরে সরে গিয়ে কেবল তাঁর বাহ্যিক লেবাস অনুকরণ করে ও সেই জীবনকে কাল্পনিক কেচ্ছা-কাহিনীর দ্বারা সাজিয়ে সমাজে শান্তি স্থাপনের পাঁয়তারা করা হয়েছে, মূলতঃ তাঁর আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আত্মিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয় নি। তাই জীবন আমাদের অশান্তির- সর্বশেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের অকল্যাণ আমাদেরকে সর্বস্বান্তভাবে গ্রাস করতে বসেছে। মনে হচ্ছে তার থেকে মরে যাওয়াই যেন অধিক শ্রেয়। এই প্রেক্ষিতে আমি আর মাত্র তাঁর একটি উপদেশের কথা বলেই আমার বলাকে শেষ করব। আর তা হলো এই- রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেশি বেশি সালাম বিনিময় করবে। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে অগ্রে অন্যকে সালাম দেয়।" তিনি এ ব্যাপারে আরো বলেছেন, হে আমার প্রিয় উম্মত! যেদিন তোমাদের মধ্যে অশান্তি ও অকল্যাণের ঝড় নেমে আসবে ফাসাদ বিবাদের ফলে রক্তের বন্যা বইবে, সমস্যাদির মীমাংসার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরস্পরের মধ্যে রক্তপাত ঘটবে। সেদিন আমার এক প্রিয় আধ্যাত্মিক সন্তান আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। যিনি তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান করে তোমাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। তোমরা তাকেও আমার সালাম পৌছে দিও। যদিবা তোমাদেরকে অগ্নির পাহাড় কিংবা বরফের সাগর ডিঙ্গিয়েও যেতে হয় তথাপি তোমরা তার কাছে যাবে এবং তার হয়ে তার কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু হায়! বাস্তব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সালাম পৌছানো তো দূরের কথা উপরন্তু যারা তাঁকে সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের গর্দান কাটার জন্যই আজ সকলে প্রস্তুত। কিন্তু খোদা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। প্রয়োজনে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে বেনজীর শাস্তির দ্বারা ধ্বংস করতঃ তাঁর প্রিয় জনকে রক্ষা করবেন এবং বিজয় দান করবেন। আর বর্তমানে হচ্ছেও তাই। আমি এই সত্য কথাটুকু বলার জন্যই এতক্ষণ এতসব বলার পাঁয়তারা করেছি। যদিবা সমস্ত জগৎ সমস্বরেও মিথ্যা বলে তবু কিছু যায় আসে না, কারণ সত্য চিরকালই সত্য। আর ইহাও সত্য যে, বিপদগ্রস্থ আজকের এই বিশ্ব কেবল এই আহ্বানে সাড়া দিয়েই শান্তিময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় নহে। তাই আমি সকল ধর্মের সকলকেই এই বলে উদাত্ত আহবান জানাতে চাই যে, আপনারা আসুন এবং খোদা প্রদত্ত সেই প্রকৃত সত্যের সাথী হউন। নিজে বাঁচুন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচান। মনে রাখবেন, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর গৃহের চতঃসীমায় প্রবেশ না করে কেবল স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে বাঁচার আর কোন অবকাশ নেই। কারণ আজ হতে শত বর্ষ পূর্বে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলে গিয়েছেন, "সেদিন তোমাদের বুদ্ধি অচল হইবে" (কিশতিয়ে নূহ)। এখন তা-ই প্রমাণিত হয়ে চলছে।

সুতরাং হে শান্তি পিয়াসী বন্ধুবর! আমি খোদার কসমসহ আত্ম প্রত্যয়ের সাথে বলছি যে, জামাতে আহমদীয়াই হলো সেই বাতিঘর যাকিনা আপনার আত্মাকে তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে সক্ষম। অতএব আপনি নিজেকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষাকল্পে তড়িৎ এই পুণ্যসত্তার সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হোন, তা না হলে আপনার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হবে অন্তঃসার শূন্য।

পবিত্র কুরআনের ছোট্ট একটি উদ্বৃতি উল্লেখপূর্বক লেখাকে শেষ করতে চাই। কুরআন বলে, তুমি বল, তোমরা ভূ-পৃথিবী ভ্রমণ কর, তৎপর পর্যবেক্ষণ কর (সত্যকে) মিথ্যা বলিতে গিয়া প্রত্যাখ্যানকারীগণের কী হইয়াছিল" (৬ঃ১২)।

- মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

সংবাদ

লন্ডন জলসায় গমনেচ্ছুক আবেদনকারীদের জ্ঞাতব্য

যেসব বন্ধু এ বছর লন্ডন জলসায় যোগদান করার জন্যে আবেদন করেছেন তাদেরকে আগামী ৩১শে মে রোজ শুক্রবার বিকেল ৩টায় নির্ধারিত কমিটির সামনে একটি সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আলাদা করে পত্র দিতে না পারার কারণে দুঃখিত।

- এ.কে. রেজাউল করীম
সদস্য সচিব

ইখরাজে নেযামে জামাত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার সদস্য জনাব শামসুল আলম ও মিসেস রাশিদা বেগম (সেকশন- ১০, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬)-এর কন্যা নাজনীন আক্তার নিজে নিজে জামাতের বাইরে অ-আহমদী ছেলেকে বিবাহ করে। বিষয়টি তার পিতা-মাতা হুযূর (আইঃ)-কে জানালে হুযূর (আইঃ) স্বয়ং নাজনীন আক্তারকে 'এখরাজে নেযামে জামাত'-এর শাস্তি প্রদান করেন।

মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্
জেনারেল সেক্রেটারী

পাক্ষিক আহমদীতে সংবাদ প্রেরণ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য

বিভিন্ন জামাত ও অঙ্গ-সংগঠন থেকে তাদের কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট আমাদের হাতে আসে। এগুলোকে সংবাদে পরিণত করা যথেষ্ট সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। এ সুযোগ আমাদের নেই। সুতরাং যারা সংবাদ ছাপাতে চান, তাদেরকে সংক্ষেপে সংবাদ তৈরী করে পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- নির্বাহী সম্পাদক

হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ শহীদের শাহাদতের পর তাঁর পরিবারের উপর অত্যাচারের ইতিবৃত্ত

মূল ঃ সৈয়্যদ মীর মাসুদ আহমদ

(তৃতীয় কিস্তি)

সরদার আমানুল্লাহ্ খান কর্তৃক সাহেব যাদাগণের মুক্তি ঃ

অবশেষে আল্লাহ্তাআলা এরূপ উপকরণ তৈরী করেন যে, আমীর হাবিবুল্লাহ্ খান সরদার আমানুল্লাহ্ খানের মায়ের ওপর অসন্তুষ্ট হন। এর আগে যখন তিনি শীতকাল বাইরে কাটানোর জন্য যেতেন তখন সরদার আমানুল্লাহ্ খান তাঁর সাথে থাকতেন। তিনি হাবিবুল্লাহ্ খানের তৃতীয় পুত্র। আর সরদার এনায়েত উল্লাহ্ খান, যিনি বড় ছেলে তাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে কাবুলে রেখে যেতেন।

তাঁর স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্টির কারণে ১৯১৮ সালের শীত মৌসুমে যখন তিনি ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ ও শিকারের জন্য লগবান, কাংড়া ও জালালাবাদের এলাকায় যান তখন তিনি এনায়েত উল্লাহ্ খানকে নিজের সাথে নিয়ে যান। আর সরদার আমানুল্লাহ্ খানকে কাবুলে রেখে যান। সরদার আমানুল্লাহ্ খান এ সময় কাবুলের শাসক ও আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় মোটামুটিভাবে সব বিষয়ের সাথে জেলখানার দায়িত্বও তাঁর ওপরে বর্তায়।

সরদার আমানুল্লাহ্ খানের স্ত্রী ছিলেন সুরাইয়া। তিনি মাহমুদ খান তরজীর মেয়ে। আমানুল্লাহ্ খান সরদার মাহমুদ খান তরজীর দ্বারা প্রভাবিত হন। মাহমুদ খান তরজী এক আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী, স্বাধীনচেতা ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী সরদার। তিনি অনেক বছর সিরিয়াতে ছিলেন।

তাঁর চেষ্টা আর ইচ্ছা যে, আফগানিস্তানের শাসন ব্যবস্থা আধুনিক উন্নত দেশের মত চালানো হোক। সরদার আমানুল্লাহ্ খান তাঁর অনুগত হওয়াতে তিনিও এ চিন্তার অধিকারী হন। তিনি আফগানিস্তানে স্বাধীন চিন্তাধারা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রচলন এবং শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নমনীয় ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি কাবুলের কোতোয়ালকে (নগর রক্ষক) সকল কয়েদীদের তালিকা পেশ করার জন্য আদেশ দেন। ওই সব কয়েদী যারা বছরের পর বছর জেলে পড়ে আছে, যাদের কেসের শুনানী হয় না বা ন্যায়-বিচারের স্বার্থে যাদের মুক্ত হওয়ার সম্ভবনা আছে তাদেরকে তাঁর সামনে পেশ করার আদেশ দেন, যাতে তাদের সম্বন্ধে শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

এরূপ প্রায় দু'শ' ব্যক্তিকে তাঁর দরবারে হাজির করা হয়। সারাদিন দরবার হতো। এভাবে তিনি অনেক কয়েদীকে ছেড়ে দেন। অনেককে পুরস্কৃত করা হয়। এজন্য অন্যান্য কয়েদীরা, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা চেষ্টা শুরু করে যেমন করে হোক সরদার আমানুল্লাহ্ খানের দরবারে তাদের পেশ করার জন্য, যাতে তাদের কেসের বিচার হয় এবং তারা কয়েদের আযাব থেকে বাঁচে।

সাহেবযাদা সৈয়্যদ আবুল হোসেন কুদসী সাহেব বর্ণনা করেন, "আমরাও চেষ্টা করি এবং দরবারে উপস্থিত হই। সরদার আমানুল্লাহ্ খানের মামা ইব্রাহীম খানের মারফত এ চেষ্টা করা হয়। তিনি আমাদের সাথে আমাদের যে মেহমানকে বিনা কারণে কয়েদ করা হয় তাকে মুক্ত করে দেন এবং আমাদের বলেন যে, তোমাদের তো সরদার নসরুল্লাহ্ খান কয়েদ করেছেন। আমি তোমাদের জন্য আলাপ করবো। তাকে ফোন করে তোমাদের সম্পর্কে আদেশ গ্রহণ করবো। আর বৃহস্পতিবার বা রবিবারে তোমাদের মুক্তির আদেশ নিয়ে ছেড়ে দেব। আমরা ফেরত আসি। দ্রুত মুক্তি না হওয়ার জন্য মর্মাহত হই।

সাহেবযাদা সৈয়্যদ কুদসী সাহেব বর্ণনা করেন, "সরদার আমানুল্লাহ্ খান তাঁর সেক্রেটারী ফকির মুহম্মদ খানের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন। কথোপকথনের সময় তিনি তাঁর মাথা নীচু করে রাখেন। আমাদের অবস্থা দেখে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। এ সময় আমার ভাই সৈয়্যদ সাহেবের বয়স বাইশ বছর। মোহাম্মদ আব্দুস সালামের বয়স ষোল বছর, মোহাম্মদ ওমরের বয়স পনর বছর। আমার (সৈয়দ আবুল হোসেন কুদসী) চৌদ্দ আর মোহাম্মদ তৈয়্যবের বার বছর।

বুধবার ইব্রাহীম খান আযীম গুন নামে তার এক আড়দালীকে জেলে আমাদের কাছে পাঠান। সে আমাদের বলে যে, ইব্রাহীম খান আপনাদের মোবারকবাদ দেয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনারা মুক্তি পাবেন।

কয়েদখানার অফিসারদের মধ্যে বাদশাহ্ খান নামে এক হাবিলদার ছিল, হযরত সাহেবযাদা সাহেবের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল। আমরা তাকে কি সিদ্ধান্ত হয় তা জানার জন্য পাঠাই। আমরা তার অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু তিনি তিনদিন পর্যন্ত আসতে পারেন নি। এরপর তার আড়দালী আমাদের বলে যে, আপনাদের সম্পর্কে কোতোয়ালের (নগর রক্ষক) আদেশ এসেছে। কোতোয়ালের হুকুম কেবল মাত্র সে সকল লোক সম্পর্কে আসে যাদের হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকে। তখন আমাদের এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমাদের জীবিত ছাড়া হবে না। কেবল মাত্র মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি হবে। এক কথা জেনে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম সব হারাম হয়ে যায়। এক অজানা দুঃখে আমরা বিষন্ন হই। কোতোয়াল আমাদের সকলকে কোতোয়ালীতে পাঠানোর জন্য জেল দারোগাকে আদেশ দেয়। আমরা রওয়ানা হই এবং নিশ্চত হই যে, এখন আমাদের মৃত্যু ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

জেলে আব্দুস সালাম, মহম্মদ তৈয়্যব ও আবুল হোসেন কুদসী তিনজনের নিউমোনিয়া হয়। আর সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ কয়েদখানায় ভীষণ ঠান্ডা ছিল। এ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অনেক লোক শীতে মারা যায়। কোতোয়ালীতে রওনা হওয়ার সময় আমাদের পায়ে বেড়ী ছিল। আর আমরা অসুস্থতার কারণে একে অপরের ওপর পড়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে মহম্মদ সৈয়্যদ কিছু সুস্থ ছিল। তার স্বাস্থ্য স্বাভাবিকভাবে ভাল ছিল। অন্য সকলে অসুস্থ ছিল। আব্দুস সালামের অবস্থা সবচে' খারাপ ছিল।

কোতোয়ালী থেকে জেল খানার দূরত্ব দু'মাইল। বেড়ী পরানোর জন্য আমাদের সকলের পায়ে ক্ষত হয়। মহম্মদ ওমর জান অত্যধিক জ্বরের জন্য পড়ে যায়। তাকে আব্দুস সালাম ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তাকে একজন সিপাই সাহায্য করে। রাস্তায় আমরা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম যে, যদি কতোয়ালীতে যাওয়ার আগে মৃত্যু হয় তবে ভাল।

আমরা কোতোয়ালীতে পৌছালে কোতোয়ালের সেক্রেটারী আব্দুল খালেক বেড়ী ভাঙ্গার জন্য আদেশ দেন। তখন আমাদের মনে বাঁচার ক্ষীণ আলো দেখা দেয়। বেড়ী ভাঙ্গা শুরু হলে কামারের যন্ত্রপাতিও খারাপ হয়ে যায়। তখন এক মাইল দূরে কামারের দোকানে গিয়ে বেড়ী ভাঙ্গতে হয়।

তখনও পর্যন্ত আমাদের ওপর পাহারাদার মজুদ ছিল। এরপর আমাদের মহকুমা শরীয়তে (ইসলামী কোর্ট) হাজির করা হয়। মহকুমা শরীয়তে কাযী আব্দুর শুকুরের আদালতে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কাযী সাহেব প্রশ্ন করেন, তোমরা ফজল করীম কাদিয়ানী পাঞ্জাবীকে জানো? আমরা বলি না। আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কাদিয়ানে গিয়েছ। আমরা বলি না। তদন্ত শেষে আমরা আবার কোতোয়ালীতে হাজির হই। সেখানে আমাদের মুক্তির আদেশ দেয়া হয়।

আমরা ছাড়া পেয়ে কাবুলের বাড়ী আসি। মহম্মদ সৈয়্যদ কয়েদ খানায় যায়। ওখানে বিছানা ও অন্য দ্রব্যাদি কয়েদীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়।

সৈয়্যদ আবুল হোসেন কুদসী সাহেবের বর্ণনা ঃ ১৯২৬ সালের ২৬শে মার্চ যে আল্ ফযল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয় যে, শেষে সরদার আমানুল্লাহ্ খানের এক সেক্রেটারীকে আমরা তিনশ' টাকা দিই। তিনি আমানুল্লাহ্ খানের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করিয়ে আমাদের মুক্ত করেন।

সাহেবযাদা মহম্মদ ওমর জানের মৃত্যু ঃ

কয়েদ খানাতে সাহেবযাদা মহম্মদ ওমর জান খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছাড়া পাওয়ার সময়ও খুব অসুস্থ ছিল। জ্বর খুব বেশী হয়। এ কারণে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ীতে চৌদ্দদিন অসুস্থ থেকে মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ...রাজেউন)।

এই আট মাস সময়ে জেলখানাতে এরূপ ভয়ঙ্কর কষ্ট দেয়া হয় যে, আমাদের একভাই মোহাম্মদ ওমর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ অসুস্থতার কারণে তার মৃত্যু হয়। আমিও (আবুল হোসেন) অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি ছাড়া পাওয়ার এক মাস পর সুস্থ হই। কিন্তু সে সময়ের অত্যাচারের চিহ্ন শরীরে এখনও মজুদ আছে (আল্ ফযল, ২৫ মার্চ, ১৯২৬)।

সাহেবযাদা মোহাম্মদ সৈয়্যদ জানের মৃত্যু ঃ

সাহেবযাদাদের মুক্তির পরে কাবুলের শাসক সরদার আমানুল্লাহ্ খান আমাদের পরিবারের সদস্যদের কিছু শর্ত সাপেক্ষে মাতৃভূমি খোশতের এলাকায় পাঠাতে চান। এ সম্পর্কে কথোপকথন হয়। যাতে সাহেবযাদা মোহাম্মদ সৈয়্যদ জান সাহেব বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্পত্তি ফেরত না দেয়া হবে আমরা দেশে ফিরতে পারি না"। এ মামলা সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকার সময় সাহেবযাদা মোহাম্মদ সৈয়্যদ জান সাহেব মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ...রাজেউন)।

কয়েদখানা থেকে বার হওয়ার এক বছর পরে আমাদের সবার বড় ভাই মোহাম্মদ সৈয়্যদ সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ১৫/১৬ দিন পর আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানকে হত্যা করা হয়" (আল্ ফযল মার্চ, ১৯২৬)।

আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের হত্যাও আমীর আমানুল্লাহ্ খানের ক্ষমতায় আরোহণ ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯১৮ সালের শীত মৌসুমে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ ও শিকারের জন্য কাবুলের পূর্বে জালালাবাদ, কাংড়া ও লগবানের সবুজ শ্যামল এলাকায় যান। আর কাবুলে নিজের ছেলে সরদার আমানুল্লাহ্ খানকে নিজের স্থলাভিষিক্ত শাসন করে আসেন। যে সকল অফিসার তার সাথে যান তারা হলেন জেনারেল মোহাম্মদ নাদীর খান, সরদার নসরুল্লাহ্ খান, দেশের গোয়েন্দা প্রধান বিগ্রেডিয়ার মির্যা মোহাম্মদ হোসেন। ভ্রমণে ও আমোদ-প্রমোদ করতে করতে কেল্লাগোজ নামক স্থানে থামেন এবং ক্যাম্প স্থাপনের আদেশ দেয়া হয়। কয়েকদিন এখানে থাকার ইচ্ছা করা হয়। ১৯১৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার আমীর নিজের তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও এক অজ্ঞাতনামা শত্রু তাঁবুতে ঢুকে আমীরের কানে পিস্তল রেখে গুলি করে। এতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের পর প্রথা অনুসারে তাঁর বড় ছেলে সরদার এনায়েত উল্লাহ্ খান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু তার চাচা সরদার নসরুল্লাহ্ খান তার দাবীকে প্রত্যাখান করেন এবং নিজে বাদশাহ্ হন। জালালাবাদ এলাকায় দরবার বসিয়ে সাধারণের কাছে এ বিষয়ে ঘোষণা করা হয়। যখন কাবুলে সরদার আমানুল্লাহ্ খান ও অন্য সব সরদারদের কাছে এ সংবাদ পৌছায় তখন তারা সন্দেহ ও বিভিন্ন ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। শাহগাজী আব্দুল কুদ্দুস খানের পরামর্শে সরদার আমানুল্লাহ্ খান কাবুলে উপস্থিত সুলতানের উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, সভাসদ ও আলেমদের এক সভা ডাকেন। সভায় জালালাবাদ এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করা হয় এবং বলা হয় যে, আমার পিতা ও দেশের বাদশাহকে ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। সরদার নসরুল্লাহ্ খান হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার উদ্যোগ নেয় নি এবং শাসক মনোনয়ন সম্পর্কে আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের ওসীয়্যতের কোন মূল্য দেন নি। তিনি সরদার এনায়েত উল্লাহ্ খানকে বঞ্চিত করে নিজেকে বাদশাহ্ হওয়ার ঘোষণা দেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সরদার নসরুল্লাহ্ খান প্রকৃত পক্ষে এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। যা কিছু হয়েছে তা কি ঠিক হয়েছে? উত্তরে সকলে বলে "না, ঠিক হয় নি।" তখন আমানুল্লাহ্ খান বলেন, "যদি এরূপ হয় আপনারা আমার সাথে থাকুন এবং প্রতিশোধ নিতে আমার সাহায্য করুন। উপস্থিত সকলে তাঁর সাথে একমত হয় এবং আমীর আমানুল্লাহ্ খানের হাতে বয়াত করে তাঁকে আফগানিস্তানের বাদশাহ্ মেনে নেয়।

তিনি এক রাজকীয় আদেশের বলে আমীর আব্দুর রহমান খান ও আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের সময় থেকে যে সব কর্মকর্তা কাজ করছেন তাদেরকে নোটিশ দেয়া হয় যে, সরদার নসরুল্লাহ্ খান ও তার সমর্থকরা, সরদার এনায়েত উল্লাহ্ খান, রাজত্বের গোয়েন্দা প্রধান ব্রিগেডিয়ার মির্যা মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের হত্যাকারী। এজন্য সকলকে বাদশাহ্ দাবীদার সরদার নসরুল্লাহ্ খানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং তাদের কয়েদী হিসাবে কাবুলে হাজির করে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করুন।

আমীর আমানুল্লাহ্ খান রাজত্বের বড় বড় কর্মচারীদের ও আত্মীয়-স্বজনদের যারা সরদার নসরুল্লাহ্ খানের সমর্থক তাদের গ্রেফতার করেন। তাদের ঘর বাড়ীও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ ছাড়া তিনি কাবুলে অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম এবং কোষাগার নিজের দখলে নিয়ে নেন।

তদন্তের পর সর্দার নসরুল্লাহ্ খানকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, সরদার এনায়েতুল্লাহ্ খান ও সরদার হোদায়েতুল্লাহ্ খানকে কাবুলে নজরবন্দী করে রাখা হয়। গোয়েন্দা প্রধান বিগ্রেডিয়ার মির্যা মোহাম্মদ হোসেনকে হত্যা করা হয়। এছাড়া অনেক অফিসারকে মৃত্যুদন্ড ও কারাদন্ড দেয়া হয়। কিছুদিন পরে সরদার নসরুল্লাহ্ খানকে গোপনে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়।

আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের বিবি আমানুল্লাহ্ খানের মা ছিলেন। তিনি কান্দাহারের এক শক্তিশালী খান্দানের মেয়ে এবং আমীরের আদরের ও প্রভাবশালী স্ত্রী। তাঁর সময়ে এ স্ত্রী খুবই কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। ১৯০৭ সালে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান হিন্দুস্থান ভ্রমণে যান। বলা হয় যে, ইংরেজরা তাঁকে বিলাসী স্বভাবের করে দেন। তার এই স্বভাব পরিবর্তন তাঁর হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর স্ত্রীর এরূপ বিলাসী স্বভাব পসন্দ ছিল না। এজন্য আমীর তার ওপর অসন্তুষ্ট হতে শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী আমীরের নজরে এত ঘৃণিত হন যে, তিনি তাকে মহল

থেকে বের করে দেন। শোনা যায় তিনি এ অপমান ভুলতে পারেন নি। তিনি নিহত আমীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের মৃত্যুতে এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। তারই চেষ্টায় নিজের ছেলে আমীর আমানুল্লাহ্ খান বাদশাহ্ হন। আমীর ফৌজের আনুগত্য হাসিল করতে সমর্থ হন। তিনি ফৌজের মাহিনা বৃদ্ধি করেন। জালালাবাদে সৈন্যরা কেবলমাত্র তার বাদশাহীকে স্বীকার করে নি। পরন্তু তারা ওই সব লোকদের গ্রেফতার করে যারা আমীর আমানুল্লাহ্ খানের বিরোধী এবং যাদের বিরুদ্ধে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

আমীর আমানুল্লাহ্ খান বাদশাহ্ হয়ে সকল প্রদেশের গভর্ণরদেরকে নতুনভাবে নিয়োগ করেন। যার মধ্যে পেশওয়ারের খান্দানের লোকদের নিয়োগ দেয়া হয়। যাদের সাধারণভাবে মিত্র হিসেবে গণ্য করা হত। জেনারেল মোহাম্মদ নাদীর খানও মিত্রদের মধ্যে ছিলেন।

আমীর আমানুল্লাহ্ খান কান্দাহার প্রদেশের সর্দারদের মধ্য থেকে লৌহনার খোশদীল খান নামে এক ব্যক্তিকে গভর্ণর হিসাবে মনোনীত করেন। এ ব্যক্তি আমীর আমানুল্লাহ্ খানের মায়ের সৎ ভাই। অন্য দিক থেকে আমীর হাবিবুল্লাহ্ খান ও আমীর আব্দুর রহমান খানের খান্দানের দাদার দিক থেকে আত্মীয় ছিলেন। আফগানিস্তানের আমীরদের বংশ তালিকা থেকে তা জানা যায় এবং এ প্রবন্ধে তা উল্লেখ হয়েছে।

আমীর আমানুল্লাহ্ খানের সিংহাসনে আরোহণের পর সাহেবযাদাগণের অবস্থা ঃ

আমীর আমানুল্লাহ্ খান বাদশাহ হয়ে তাঁর পিতার মৃত্যুতে ৭দিন শোক পালন করেন। এর পর কয়েক মাস সিংহাসনারোহণ উৎসব পালন করা হয়। কাবুলের বাইরে থেকে বড় বড় লোক ও কাবুলের সর্দারদের আমীরের বয়াত নেয়ার জন্য ডাকা হয়। আর তাদের খাতিরে দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়। দক্ষিণ দিক ও আশপাশ এলাকা থেকে লোকদের ডাকা হয়। এর মধ্যে একজন বড় লোক খান ববরক খানও ছিলেন। যিনি হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ মোহাম্মদ আব্দুল লতীফ শহীদের উপর ঈমান রাখতেন। তিনি যখন আমীরের বয়াত নেয়ার জন্য যান তখন তার সাথে সাহেবযাদা আব্দুস সালাম সাহেবের দরবারে সাক্ষাৎ হয়। এ সময় খান বরবক খান বাদশাহ্কে সাহেবযাদাদের জন্য দরখাস্ত করেন যে, তাদের মাতৃভূমিতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। তখন বাদশাহ্ হুকুম দেন, সাহেব যাদাদের খুশতে ফেরত পাঠানো হোক ও তাদের সম্পত্তি ফেরত দেয়া হোক।

"যখন আমীর আমানুল্লাহ্ খান শাসনকর্তা হন। তাঁর শাসনের প্রাথমিক যুগে খুশ্তের এলাকা থেকে নেতৃবৃন্দদের প্রধান ছিলেন বাবরক খান নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি দরখাস্ত করেন তখন আমীর আমানুল্লাহ্ খান সাহেব আমাদের মাফ করে দেন এবং সাথে সাথে এ আদেশ দেন যেন আমাদের জমি ফেরত দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আমাদের আমানুল্লাহ্ খানের পক্ষ থেকে এক আদেশ দেয়া হয়। যা আমরা আমাদের এলাকা খুশ্তের গভর্ণরের কাছে দিই। ... এভাবে আবার একবার আমাদের খানদান নিজেদের বাড়ীতে আসে এবং জীবন যাপন করতে শুরু করে" (আল্ ফযল মার্চ, ১৯২৬)।

হযরত সাহেবযাদা শহীদের পরিবারের নিজেদের মাতৃভূমি খুশ্তে ফেরত ঃ

বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ খান হযরত সাহেবযাদা সাহেবের পরিবারকে খুশ্তে ফেরত যাওয়ার অনুমতি দেন এবং তাদের জমি জমা ফেরত দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। তিন দিনের মধ্যে তারা খুশ্তে রওনা হয়।

সরদার শেঁরেদীল খান যিনি আব্দুর রহমান খান ও আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের প্রাথমিক সময়ে খুশ্তের শাসনকর্তা ছিলেন। এখন তার পুত্র আতা মোহাম্মদ খান খুশ্তের শাসক ছিলেন। সরদার শেঁরেদীল খানের পরিবারের সকলের সাহেবযাদা সাহেবের ওপর বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর বিবি হযরত সাহেবযাদা সাহেবের বয়াত করে ছিলেন। তাঁর এক ছেলে সরদার আব্দুর রহমান জান হযরত সাহেবযাদা সাহেবের শাহাদতের সময় কাবুলে উপস্থিত ছিল। যখন সৈয়্যদ আহমদ নূর কাবলী হযরত সাহেবযাদা সাহেবের লাশ পাথরের নীচে থেকে বার করে শবাধারে রেখে কাবুলের কবরস্থানে অস্থায়ী কবর দেয় তখন এসব কাজে সরদার আব্দুর রহমান জান সাহায্য করেন। আর সৈয়্যদ আহমদ নূরকে টাকা দেন যাতে তিনি শবাধার ও কাফন কিনতে পারেন। যখন শবাধার কবর স্থানে নিয়ে আসা হয় তখন সরদার আব্দুর রহমান জান তাঁর জানাযা পড়ান। ওই সবদিনে তারা আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। সৈয়্যদ আহমদ নূরের হাতে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে একটি জায়নামাযও তোহ্ফা হিসাবে পাঠান।

এ সব কারণে খুশ্তের শাসক আতা মোহাম্মদ খানের সাথে সাহাযাদাগণের হৃদ্যতা ছিল। শাহাযাদাদের সাথে তার সাক্ষাতের সাথে সাথে তিনি নিজের সেক্রেটারীকে ডেকে তাঁদের দু'টি চিঠি দিতে বলেন। একটি চিঠি খুশ্তের ব্রিগেডিয়ারের নামে দেয়ার জন্য। তার নাম শাহ বজরগ। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল হযরত সাহেবযাদা সাহেবের পরিবারকে তাদের জমি ফেরত দেয়া হোক। দ্বিতীয় চিঠি চমকানীর শাসকের নামে। তার নাম ছিল মহিউদ্দিন। চমকনীতেও জমি ছিল। খুশ্তের জমি সাথে সাথে পাওয়া যায়। চমকনীর শাসনকর্তার নামের চিঠি সাহেবযাদা আব্দুস সালাম খান নিয়ে যান। তিনি চিঠি হাবিলদার পাদশা খানের কাছে দেন। তিনি প্রথমে কাবুলে থাকতেন। তার সাথে এ পরিবারের পুরনো সম্পর্ক ছিল। তিনি চমকনীর জমির ব্যবস্থা করে দেন। এ জমি ১২ খন্ডে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে এক অংশ সাহেবযাদাগণের ছিল।

জমি-জমা ফেরত পাওয়ার পর এ পরিবার আরামের সাথে নিজের দেশে বাস করতে থাকে। সাহেবযাদাগণের ফেরত আসার খবর শুনে দূর দূর থেকে আত্মীয়রা আসতে থাকে। তারা উপহারও পেশ করে। এছাড়া আহমদীরাও দুম্বা (মেষ) ইত্যাদি পেশ করে।

সাহেবযাদা আবুল হোসেন কুদশী সাহেব বর্ণনা করেন ঃ কোন কোন আত্মীয় আমাদের সম্পর্কে খুশ্তের ব্রিগেডিয়ার শাহ বজরগের নিকট রিপোর্ট করে যে, শাহযাদা আব্দুল লতীফ খানদানের লোকদের খুশ্তের আহমদীদের সাথে যোগাযোগ আছে। তাদের কাছ থেকে তোহ্ফা ও অর্থ আসা শুরু হয়েছে। এজন্য তাদের ওপর নজর রাখা জরুরী। সেখানে এমন একটি লোক ছিল যার সাথে সাহেবযাদা আব্দুস সালাম জান সাহেবের সম্পর্ক ছিল। তিনি আব্দুস সালাম জান সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। আব্দুস সালাম জান দেখা করার জন্য যান। তিনি খুশ্তের ব্রিগেডিয়ার শাহ্ বজরগকে বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু দুশমন আছে। আমাদেরও বড় বড় শত্রু আছে। এ জন্য যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ হয় তবে অবশ্যই তদন্ত করবেন। ব্রিগেডিয়ারের সাথে আব্দুস সালামের ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি খুব সম্মানের সাথে বলেন, অবশ্যই অনুসন্ধান করা হবে। যদি বিনা তদন্তে কিছু করা হতো তবে ততদিনে আমি কিছু করতাম। যখন থেকে আপনারা খুশ্তে এসেছেন আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট এসেছে। কিন্তু আমি সেগুলো বাতিল করে দিয়েছি। আমি নিজেই এগুলোকে মিথ্যা মনে করি। (চলবে)

অনুবাদ - **কওসার আলী মোল্লা**

পাক্ষিক আহমদী ♦৩২

নতুনদের পাতা

মানব জাতির শ্রেষ্ঠ রসূল করীম (সঃ)

মানব জাতিকে আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ জীব আখ্যা দিয়ে। শুধু তাই নয় এই জাতিতে খোদাতাআলা পাঠিয়েছেন পৃথিবীর সর্বকালীন সর্বজগতের শ্রেষ্ঠ মহামানবকে। তা হলে চিন্তা করে দেখুন এই মানব জাতি কত সৌভাগ্যবান। আরও সৌভাগ্যবান তারাই যারা এই মহান ব্যক্তির অনুসারী হতে পেরেছেন।

সৈয়্যদুল আওওয়ালীন ওয়া আখেরীন, সরদারে দু'আলম, শাফীউল মুযনেবীন, মাহবুবে রব্বুল আলামীন, খাতামান্নাবীয়িন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হলেন এই মহামানব তিনি সকল যুগের সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক ও শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পূর্বেও কেউ এই পূর্ণতম ও সর্বোচ্চ মার্গে উন্নীত হন নি এবং তাঁর পরে ও অর্থাৎ কিয়ামত কালব্যাপী কেউ হতেও পারবে না।

এ মহান ব্যক্তির সম্পর্কে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন "নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট এসেছে। তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনীনদের প্রতি সে পরম ক্ষমতাশীল, দয়াময় (সূরাতুত্তাওবা ঃ ১২৮)। তারপর আবার বলেছেন "এবং আমরা তোমাকে [আঁ হযরত (সঃ)] বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি" (সূরাতুল আম্বিয়া ঃ ১০৮)।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির আশীর্বাদ ও রহমতস্বরূপ, যেহেতু তাঁর বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ পূর্বে কখনও তাদের উপর আল্লাহ্‌তাআলার রহমত এরূপ ব্যাপক আকারে বর্ষিত হয় নি।

আল্লাহ্‌তাআলা আবার বলছেন, "নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে" (সূরাতুল আহযাব ঃ ২২)।

হাদীসে বর্ণিত আছে "একবার হযরত আমের (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমের বললেন, কেন (পড়ব) না? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চরিত্র তো কুরআনই" (নিসাঈ)।

হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পুণ্যময় সত্তা ছিল অনুপম। মহত্তম গুণাবলী ও সর্ববিধ সৌন্দর্যে সুষমন্বিত ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌তাআলা চরিত্রের সকল মাধুর্য ও উচ্চ গুণাবলী রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র সত্তায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য হতে কেউ বঞ্চিত হয় নি। এমন কি বৃক্ষ ও জীব-জন্তুও তার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এই মহান ব্যক্তির সম্বন্ধে বলেন, "জগতে আল্লাহ্‌র এক মহিমান্বিত রসূল (হযরত মুহাম্মদ-সঃ) এসেছেন, যাতে সেই সকল (আধ্যাত্মিক) বধিরদেরকে কর্ণ দান করেন, যারা আজ হতে নয় বরং শত সহস্র বৎসর ধরেই বধির। কে অন্ধ এবং কে বধির? সেই ব্যক্তি অন্ধ ও বধির যে তৌহীদ গ্রহণ করে নি এবং সেই রসূলকেও গ্রহণ করে নি, যিনি নুতনভাবে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে তৌহীদকে কায়েম করেছেন। সেই রসূল যিনি বন্য ও পশু স্তরের লোকদেরকে সভ্য মানুষ এবং সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করেছেন অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীকে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন।

অতঃপর চরিত্রবান মানুষদেরকে খোদাযুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত করে ইলাহী রঙে রঙীন করেছেন। সেই রসূল, হ্যাঁ সত্যের সেই প্রজ্জ্বল সূর্য যার পদতলে সহস্র সহস্র মৃত শিরক (অংশীবাদিতা), নাস্তিকতা, অবাধ্যতা, পাপাচারের কবল হতে মুক্ত হয়ে জীবন লাভ করেছে এবং কার্যকররূপে যিনি কিয়ামতের নমুনার দৃশ্য দেখিয়েছেন। সেই মহানবী (সঃ) মক্কায় আবির্ভূত হয়ে শিরক এবং মানব পূজার গভীর অন্ধকারকে তিরোহিত করেছেন। হ্যাঁ, জগতের প্রকৃত জ্যোতিঃ একমাত্র তিনিই ছিলেন; তিনি জগতকে তমাসাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হয়ে বাস্তবিক পক্ষে সেই আলো দান করেছিলেন তা অন্ধকার রাত্রিকে দিন করে ছিল। তাঁর আগমনের পূর্বে জগৎ কেমন ছিল? অতঃপর তাঁর আগমনের পর তা কীরূপ করেছিল? এটা এমন কোন প্রশ্ন নয়, যার উত্তর মোটেও কঠিন হতে পারে; যদি আমরা বে-ঈমানীর পথ অবলম্বন না করি তাহলে আমাদের বিবেক নিশ্চয় আমাদের ঘাড় ধরে আমাদেরকে স্বীকার করতে বাধ্য করবে যে, এই মর্যাদাবান রসূলের পূর্বে খোদাতাআলার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রতিটি দেশের মানুষ বিস্মৃত হয়েছিল এবং সেই প্রকৃত মা'বূদ (উপাস্য)-এর সকল গৌরব ও মর্যাদা অবতার দেব-দেবী, প্রস্তর, তারকা নক্ষত্র- গাছ বৃক্ষ ও জীব-জন্তু এবং মরণশীল একজন মানবকে দান করা হয়েছিল এবং তুচ্ছ ও হীন সৃষ্ট জীবকে সেই মহাপ্রতাপশালী ও পবিত্রতম খোদার স্থান ও আসনে বসানো হয়েছিল। আর এটা একটি নির্ভুল ও সঠিক সিদ্ধান্ত যে, যদি এই সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু ও গাছ-বৃক্ষ এবং তারকা নক্ষত্রই খোদাস্বরূপ হতো যেগুলির মধ্যে যীশু-ও একজন, তা হলে বলা যেত এই রসূলের কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু যেহেতু (যীশু সহ) এ সকল জিনিস কখনও খোদা ছিল না সেহেতু সেই দাবী এক মহা জ্যোতিঃ বহন করে। সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মক্কার পর্বতমালার উপড়ে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, সেই দাবী কি ছিল? তা ছিল এই যে, তিনি বলছিলেন, "খোদাতাআলা জগতকে শির্‌কের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে সেই অন্ধকারকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠিয়েছেন।" উহা শুধু একটা দাবীই ছিল না বরং রসূলে মকবুল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উক্ত দাবীকে বাস্তবে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। যদি কোন নবীর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সেই সকল কীর্তির দ্বারা প্রতীয়মান হতে পারে যে সকল কীর্তির মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ও সত্যিকার সহানুভূতি সকল নবীর তুলনায় অধিক পর্যায়ে প্রকাশিত হয় তাহলে হে সমগ্র মানবকুল! উঠ এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে জগতের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কোন নযীর নি।"(তবলীগে রেসালত-ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৯ / প্রকাশিত পাক্ষিক আহমদী ১৯৯১ / ৩০শে সেপ্টেম্বর)।

এখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং তারিখে মসজিদে আকসা, রাবওয়ার প্রদত্ত খুৎবা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি। যা তিনি হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের স্মরণে বলেছেন, তিনি বলেন, "হযরত নবীয়ে আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' রূপে সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছেন। 'রহমাতুল্লিল আলামীন' এর মধ্যে শুধু মানুষেরই উল্লেখ নয় বরং অন্য যাবতীয় সৃষ্টি ও উহার আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তিনি শুধু মানুষের জন্যই রহমত বা করুণাস্বরূপ নহেন এবং মানুষ ছাড়া খোদার অন্যান্য মখলুক তথা নিখিল সৃষ্টির জন্যই তিনি করুণা ও রহমত স্বরূপ। এবং ইসলামী বিধান ও শিক্ষা আদ্যোপান্ত মানুষ ছাড়া অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টির সম্যক হক ও অধিকার ব্যক্ত করে এবং সেগুলির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণেরও উপায় উদ্ভাবন করে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যেহেতু আলামীনের (সমগ্র বিশ্ব) জন্য রহমতস্বরূপ এবং মানুষ আলামীনেরই অংশ বিশেষ, সেহেতু আলামীনের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্যও তিনি রহমতস্বরূপ। অবশ্য এই মহান করুণার বৃহদাংশ মানুষই প্রাপ্ত হয়েছে। তারপর ঘোষণা করা হয়েছে', "আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি" (সূরাতুল আ'রাফ ঃ ১৫৯)।

তারপর আবার ঘোষণা করছেন, "সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে এনেছি" (সূরাতুস্ সাবা ঃ ২৯)।

এই ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ)-এর খুৎবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অসামান্য জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় মানব জাতির জন্য তিনি এমন একজন আদর্শ ছিলেন যা কল্পনা করাও কঠিন। তিনি এমন কোন কিছুকে বাদ রাখেন নি যে, তার উম্মতকে কষ্টে পড়তে হবে।

প্রথমে আমি এই নিষ্পাপ ব্যক্তির যে আল্লাহ্‌র উপর অটল বিশ্বাস ছিল তা আলোচনা করছি ঃ "তিনি এমন ছিলেন যে, জীবনের কোন মুহূর্তেই খোদা-প্রেমে সামান্য ফাটল ধরে নি। জীবনের চরম সঙ্কটকালে তিনি যেমন আল্লাহ্‌তে পূর্ণ আস্থা রেখেছেন তেমনি আবার ধন-দৌলত, লোভ-লালসার আহ্বান বা বিজয়ের চরম উল্লাসও তাঁকে উক্ত বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। যেমন ঃ মক্কাবাসীদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা ও অত্যাচার উৎপীড়ন যখন রসূলুল্লাহ্‌কে ইসলামের আদর্শ প্রচার থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা তাঁকে ধন দৌলত, সুন্দরী নারী ও জাতির নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব দানের লোভ দেখিয়ে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা করলো। রসূলুল্লাহ্‌র মনের কোণে যদি ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও বিলাসিতা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় থাকতো তবে নিশ্চয় তিনি এই আহ্বানকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার ব্যাপারটি রসূলে করীমের জীবনে একটি অত্যুজ্জ্বল ঐশী-প্রেমের উদাহরণ।

জন্ম স্থান সবার নিকটই অতি প্রিয়। এর প্রতি ধূলিকণার সাথে শৈশব ও কৈশোরের হাসি-কান্না, খেলাধূলা, যৌবনের রঙিন স্বপ্ন ও কর্ম জীবনের ধ্যান-ধারণার স্মৃতি বিজড়িত।

মক্কাবাসীদের অত্যাচারে রসূল করীম (সঃ)-এর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না; ছিল না কোনো প্রতিশোধ নেবার বাসনা। তিনি তাদের মঙ্গল চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন এবং স্বপ্নে ও ভাবেন নি তিনি জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে সেই প্রিয় জন্মভূমিও ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না তিনি।

মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র যখন চরমে উঠলো। তার জীবন নাশের উদ্দেশ্যে সময় নির্দিষ্ট করে তারা যখন সংকল্প গ্রহণ করলো তখন তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে গভীর রাত্রে মদীনার পথে যাত্রা করলেন এবং হযরত আবূবকর (রাঃ)-কে নিয়ে সওর গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। কোরেশগণ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। কয়েকজন শত্রু উক্ত গুহার অতি নিকটেই সমুপস্থিত। এমন কি তাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বিচলিত হয়ে ওঠলেন। তিনি হযরত (সঃ)-কে বললেন, "শত্রুরা সংখ্যায় অনেক, আর আমরা মাত্র দু'জন' কী হয়।" রসূল করীম (সঃ) শান্ত কণ্ঠে বললেন, আবূ বকর আপনি ভুল করছেন, আমরা দু'জন নই- আরো একজন আছেন সাথে, আমাদের আল্লাহ্ রয়েছেন।" এই কথোপকথনটি সেই সময়কার ঘটনাবলীর মাধ্যমে রসূল করীম (সঃ) যে আল্লাহ্‌তাআলার উপর কীরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন ও জীবন পথে সর্বক্ষণ স্রষ্টাকে স্মরণ রাখতেন, তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলা যে কোন বিপদ থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করতে পারেন, সন্দেহাতীতভাবে তাঁর জীবনাচরণে তিনি তা-ও প্রমাণিত করলেন। স্রষ্টার সাথে দৃঢ় সংযোগ ঘটলে, জাগতিক দৃষ্টিতে নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থা পরম শত্রু কবলে পড়েও মানুষ কত শান্ত ও নির্বিকার হতে পারে। সহজ সরলভাবে যে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে রসূলে খোদা উম্মতের জন্য জ্বলন্ত নিদর্শন স্থাপন করলেন।

একদা কোন বেদুঈন হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পথ আগলে তলোয়ার উঁচিয়ে হাঁক ছেড়ে বল্লো "মুহাম্মদ, বলো, কে তোমাকে রক্ষা করবে?"

এখানে কেউ তাঁর সহায় নেই। 'মাকড়সার জাল' বোনারও সুযোগ নেই। একটি কথাই শুধু এখন তাঁর এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখন তাঁর হত্যাকারীই তাঁর প্রাণ রক্ষাকারী। সে ছাড়া আর কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারে না। এই কঠিন সময়ে তাঁর ঈমানের পরীক্ষা হয়ে গেল। খোদার রসূল (সঃ) দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চরণ করলেন, "আল্লাহ্ রক্ষা করবেন," এ কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর তরবারী হস্তচ্যুত হয়ে পড়ল।

ওহুদের যুদ্ধ ঃ এই যুদ্ধে সাময়িকভাবে মুসলমানদের পরাজয় ঘটেছে। সাহাবাগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছেন। রসূলুল্লাহ্ আহত। তাঁর পবিত্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত। সম্মুখের পবিত্র চারটি দাঁত ভেঙ্গেছে। খোদার রসূল মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর তিনি চেতনা ফিরে পেলেন। এদিকে শত্রুরা বিজয় উল্লাসে মাতোয়ারা। দম্ভোক্তি করে তারা প্রধান প্রধান সাহাবা ও রসূলুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে তাঁদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। সাহাবাগণ তাঁর জবাব দিতে উদ্যত হলেন, রসূল করীম (সঃ) তাঁদের বারণ করলেন। এদিকে শত্রুরা তাদের দেবতা হুবলের জয় ধ্বনি করে বলে উঠলো, "হুবলের নিকট মুহাম্মদের খোদার পরাজয় ঘটেছে।" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ সবাইকে তাগিদ দিয়ে বললেন, "এখন তোমরা বসে আছ কেন"? সাথে সাথে মুসলমানগণ আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুল্লেন। আল্লাহ্‌র অপমান তিনি কোন অবস্থাতেই বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না।

বস্তুত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ইসলামের আগমন। তাঁর জয়ধ্বনি করাই মু'মিনের কাজ এবং জিন্দেগীর পরম ও চরম লক্ষ্য। খোদার রসূল যুদ্ধ ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও আমাদের জন্য রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে রসূলে করীম (সঃ) যে নামাযে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও ধ্যান-ধারণায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন, আল্লাহ্‌র নামে সব কাজ আরম্ভ করতেন, কাজ শেষ করে আল্লাহ্‌রই শুকরগুযারী করতেন- এ সব বিষয় এখানে না উল্লেখ করলেও হবে আমার মনে হয়। কারণ রসূল করীম (সঃ) ছোট থেকে ছোট কাজও শুরু করতেন মহান আল্লাহ্‌র নামে।

খোদা-প্রেমে যেমন রসূলুল্লাহ্ ছিলেন অতুলনীয় ও পরিপূর্ণ তেমনি ছিলেন মানব-প্রেমের ক্ষেত্রে। তিনি যদি খোদা-প্রেমে বিভোর হয়ে বাস্তব জগৎ থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন, তবে মনে হয় জীবনে তাঁকে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হত না। বস্তুত সর্বকালে সর্বযুগে মানুষকে 'সুন্দর' করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর বাগান সুষমায় ভরে দেয়ার জন্য রসূলে করীমের বিরামহীন চেষ্টার দরুনই তাঁকে পদে পদে দুঃখ-দুর্ভোগ বরণ করতে হয়েছিল।

মানুষ তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রতি অত্যাচার ক'রে ইতিহাসকে যেভাবে কলংকিত করেছে বোধ হয় সে শত্রুর উপরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তেমন উদাহরণ সৃষ্টি করে নি। রসূলে করীম (সঃ) ছিলেন মানুষের সব চেয়ে বড় কল্যাণকামী। আর তাঁর উপরেই হয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি যুলুম। এক বৃদ্ধ রসূল করীম (সঃ)-এর মতামত পসন্দ করতো না এবং সেই আক্রোশে তাঁর যাবার পথে সে প্রতিদিন কাঁটা ফেলে রাখতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটলো। রসূলে করীম (সঃ) লক্ষ্য করলেন, সেই বুড়ীতো এখন পথে কাঁটা ফেলে রাখছে না। তিনি ভাবলেন, বৃদ্ধার নিশ্চয়ই কোন অসুখ করেছে। যদি তাই হয়। আহা! তবে তো এই বয়সে তার সেবা-শুশ্রূষার দরকার। খোদার হাবীব উদ্বিগ্ন চিত্তে বৃদ্ধার বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। "মা, তোমার কোন সেবায় আমি লাগতে পারি"? তা হলে একটু নিজ হৃদয়ে চিন্তা করে দেখুন কেমন ধরনের মানব-প্রেম বিরাজ করছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে। যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি হতেন তাহলে তো দোয়া করতেন যে, অসুস্থ হয়েছে ভাল হয়েছে। কিন্তু মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ যিনি তিনি তার ঘরে গিয়ে সেবার হাত বাড়ালেন।

উহুদ রণক্ষেত্রে রসূল করীম (সঃ) কাতরভাবে হৃদয়ের আকুতি নিবেদন করছেন, "হে পরওয়ারদিগার যারা তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নবীকে এমনভাবে আঘাত হানতে পারে, তারা কি করে জগতে উন্নতি করবে? হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে ক্ষমা করো। তারা অজ্ঞ তারা ভ্রান্ত।" এ যুদ্ধে রসূল করীম (সঃ) মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মুর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই তিনি তাঁর জাতির জন্য আল্লাহ্র দরবারে হাত উঠিয়ে উপরোক্ত দোয়া করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায়। রসূল করীম (সঃ)-এর মানবতাবোধ কী গভীর ও অতুলনীয় ছিল। কিছু পূর্বেই যাদের কারণে তিনি জীবন হারাতে যাচ্ছিলেন, তাদের জন্যই আল্লাহ্র দরবারে এমন ক্ষমার আকুতি করেন। তার নিজের কথা। সাহাবাদের কথা, শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার কথা তিনি ভাবছেন না, তিনি তখন ভাবছেন আল্লাহ্র রসূলের উপর এরূপ অকথ্য অত্যাচার করায়, খোদার গযব যেন ওদের উপর পতিত না হয়। (তথ্য সংগ্রহ ঃ পাক্ষিক আহমদী ১৯৯১)

সেই সব কথাগুলো যদি আমরা সৎ হৃদয়ে চিন্তা করি তাহলে প্রতিটি হৃদয়ে অশ্রুপাত হতো।

আসুন এখন আমরা এই মহান ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করি ঃ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রকাশ্য ও গোপন (দেহ ও মনের) পবিত্রতা ঃ

"রসূল করীম (সঃ) সম্পর্কে পরিষ্কার জানা যায় যে, তিনি কখনও কোন খারাপ কথা বলতেন না, এবং না কখনও অহেতুক কসম খেয়ে কিছু বলতেন" (বুখারী)। আরবের মত দেশে বসবাস করে এ ধরনের চরিত্র অর্জন করা ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। এ কথা তো আমরা বলতে পারি না যে, আরবের লোকেরা তখন অভ্যাসগতভাবেই অশ্লীল বা ফাহেশা কথাবার্তা বলতো। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবরা কসম খাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এবং আজও অব্দি আরবদের মধ্যে এ কসম খাওয়ার রেওয়াজ ব্যাপক আকারেই প্রচলিত আছে। কিন্তু রসূলে করীম (সঃ) খোদাতাআলার প্রতি এত বেশি আদব বা শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতেন যে, অযথা তাঁর নাম উচ্চারণ করাও পসন্দ করতেন না।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) পাক সাফ থাকার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনি প্রায় সময় মেসওয়াক করতেন এবং এ ব্যাপারে (দাঁত মুখ পরিষ্কার রাখার জন্যে) এত বেশি জোর দিতেন যে, কখনো কখনো বলতেন, আমি যদি এ ভয় না করতাম যে, মুসলমানদের কষ্ট হবে, তাহলে আমি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করার হুকুম দিতাম (মিশকাত)।

খাবার খাওয়ার পূর্বেও তিনি হাত ধুয়ে নিতেন, খাওয়ার পরেও হাত ধুয়ে ফেলতেন। কুল্লী করতেন। বরং রান্না করা সব রকমের খাদ্য গ্রহণের পরই তিনি কুল্লী করতেন। এবং রান্না খাবার গ্রহণের পর কুল্লী না করে নামায পড়াকে অপসন্দ করতেন (বুখারী)।

মসজিদ বা মুসলমানদের সমবেত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান। তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। এবং মুসলমানদেরকে এ কথা বারবার বলতেন যে, সমবেত হওয়ার বিশেষ দিনগুলিতে জুমুআর দিনে মসজিদগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখবে এবং সেগুলিতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি জ্বালাবে, যাতে বাতাস পরিশুদ্ধ হয় (মিশকাত)।

রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখার জন্য আঁ হযরত (সঃ) বারবার উদ্বুদ্ধ করতেন। যদি রাস্তার উপরে কোন জঞ্জাল কিংবা ইট পাথর কিংবা ময়লা-আবর্জনা কিছু পড়ে থাকতে দেখতেন তাহলে তিনি তা স্বয়ং নিজ হাতেই রাস্তার এক কোণে রেখে দিতেন এবং বলতেন যে, যে ব্যক্তি রাস্তা-ঘাটে পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেয় খোদা তার প্রতি খুশী হন এবং তাকে সওয়াব বা পুরস্কার দান করেন (মুসলিম)।

খাদ্য-দ্রব্যে সরলতা ও তাক্ওয়া (খোদা-ভীরুতা) ঃ

খাবার ব্যাপারে আঁ হযরত (সঃ) সর্বদা অত্যন্ত সরল বা সাদাসিদা ছিলেন। খাবারের মধ্যে লবণ বেশি হলো বা কম হলো কিংবা রান্না খারাপ হলো এসব ব্যাপারে তিনি কখনও কিছু বলতেন না; বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। তিনি যখন খাবার খাওয়া শুরু করতেন, তখন খাদ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বসতেন এবং বলতেন, আমার এ ধরনের ফুটানীর ভাব পসন্দ নয় যে, অনেকে এমনভাবে খাবার খায় যেন বিষয়টা তাদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয় (বুখারী)।

আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে যখন খাবারের কোন কিছু আসতো তখন তিনি তা সাহাবাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন এবং নিজেও খেতেন। একবার তাঁর কাছে কিছু খেজুর (নজরানা স্বরূপ) এলো। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, প্রত্যেক সাহাবার ভাগে সাতটি করে খেজুর পড়ে, তিনি সাতটি করেই সবাইকে ভাগ করে দিলেন (বুখারী)।

যখন তিনি (সঃ) খাবার খেতেন, 'বিস্মিল্লাহ্' বলেই শুরু করতেন। এবং যখন খাওয়া শেষ করতেন তখন আল্লাহ্তাআলার প্রশংসা করতেন এভাবে যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্তাআলার যিনি আমাদেরকে খাবার খাইয়েছেন। অনেক অনেক প্রশংসা।

আঁ হযরত (সঃ) সব সময় ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন এবং ডান হাত দিয়ে পানি পান করতেন। পানি পান করার সময় মধ্যখানে তিনবার শ্বাস নিতেন। এর মধ্যে একটা

স্বাস্থ্যগত হেকমতও ছিল। কেননা, পানি যদি একদমে খাওয়া হয়, তাহলে বেশি পরিমাণে খাওয়া হয়। এবং এতে করে হজমে গোলমান দেখা দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে আঁ হযরত (সঃ)-এর নীতি এটাই ছিল যে, যে খাদ্য পবিত্র ও পরিমিত তা-ই খাওয়া উচিত।

পোষাক ও গহনা-পাতির ক্ষেত্রে সরলতা ও খোদা-ভীরুতা ঃ

পোষাকের ব্যাপারে ও রসূলে করীম (সঃ) অত্যন্ত সাদাসিদা ব্যবস্থাই পসন্দ করতেন। সাধারণতঃ তাঁর পোষাক ছিল কোর্তা (পাঞ্জাবী) এবং তহবন্দ (লুঙ্গী) কিংবা পাঞ্জাবী ও পাজামা। তিনি তাঁর লুঙ্গী বা পাঞ্জাবী পরতেন হাঁটুর নীচে টাখনুর উপর পর্যন্ত। হাঁটু বা হাঁটুর উপরে কোন অংশ নাংগা হয়ে যাওয়া তিনি পসন্দ করতেন না। বাধ্য-বাধকতা থাকলে সে ভিন্ন কথা। এমন কাপড় যার উপর ছবি আঁকা থাকতো তা তিনি পসন্দ করতেন না। তা সে পরনের কাপড়ই হোক আর টানানো পর্দা ইত্যাদিই হোক। বিশেষ করে বড় বড় ছবি যা কিনা শির্ক বা অংশীবাদিতার ইঙ্গিতবহ সেগুলোর ছাপযুক্ত কাপড় ব্যবহারের অনুমতি তিনি কখনই দিতেন না। এ ধরনের কাপড় একবার তিনি তাঁর ঘড়ে লটকানো দেখতে পেলে তা খুলে রেখে দিয়েছিলেন (বুখারী)।

বিছানা বা শয্যার ব্যাপারে সরলতা ঃ

আঁ হযরত (সঃ)-এর বিছানা-পত্রও ছিল নিতান্ত সাদাসিদে। সাধারণতঃ একটি চামড়া কিংবা উটের পশম দিয়ে তৈরী একটি কাপড়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেছেন, "আমাদের বিছানা এত ছোট ছিল যে, যখন রসূল করীম (সঃ) রাত্রে ইবাদত করার জন্য উঠতেন তখন আমি এক পাশে করে গিয়ে জড়ো হয়ে থাকতাম। এর কারণ ছিল যে, বিছানাটা ছিল ছোট। যখন ইবাদতের সময় তিনি খাড়া হতেন তখন আমি হাঁটু সোজা করতে পারতাম, আর যখন তিনি সিজদাহ্ করতেন তখন আমি হাঁটু জড়ো করে নিতাম" (বুখারী)।

বাড়ী ও বসবাস-এর ক্ষেত্রে সরলতা ঃ

বাসগৃহের ব্যাপারেও তিনি (সঃ) সাদাসিদে থাকাই পসন্দ করতেন। সাধারণতঃ তার ঘরগুলো এক কামরার এবং তার সামনে ছোট আঙ্গিনা। সেই কামরার মাঝখান দিয়ে টানানো থাকতো একটা রশি। রশিটার উপরে কাপড় ঝুলে দিয়ে তিনি আলাদা এক পাশে সাক্ষাত প্রার্থীদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি চারপায়ী বা চৌকি বা খাট ব্যবহার করতেন না। বরং মাটির উপরেই বিছানা পেতে শুতেন। তিনি জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এত বেশি সাদাসিদে ছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ওফাতের পরে বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবিত কালে আমাদেরকে কয়েক বার শুধু পানি আর খেজুর খেয়েই দিন কাটাতে হয়েছিল। এমনকি, যেদিন মৃত্যু হয় সেদিনও আমাদের ঘরে পানি ও খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না (বুখারী)।

গোলাম বা দাসদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ঃ

গোলামদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার জন্য তিনি (সঃ) সর্বদাই আদেশ উপদেশ দিতেন। তাঁর এই নির্দেশ ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির কাছে কোন গোলাম থাকে। এবং উক্ত গোলামকে আযাদ বা স্বাধীন করে দেয়ার তৌফীক বা সামর্থ্য যদি তার না থাকে, এবং সে যদি কখনো ক্রোধের বশে সেই গোলামকে মারধর করে কিংবা গালি দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, ঐ গোলামকে আযাদ করে দেয়া (মুসলিম)। তিনি আরও বলতেন, যে একজন গোলামকে ঠিক ততটুকু কাজই করাবে যতটুকু কাজ করতে সে সক্ষম। আর যখন তার দ্বারা কোন কাজ করাবে তখন তার সঙ্গে সেই কাজে নিজেও অংশ গ্রহণ করবে, যাতে করে সে নিজেকে হেয় মনে না করে (মুসলিম)।

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার ঃ

প্রতিবেশীর সঙ্গে তিনি (সঃ) অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন, 'জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে বার বার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকতেন। এমন কি আমার মনে হতো, পাছে না আবার প্রতিবেশীদেরকেও উত্তরাধিকার করা হয়' (বুখারী)।

হযরত আবূ যর (রাঃ) বলেছেন, আমাকে রসূলে করীম (সঃ) বলতেন, হে আবূ যর! যখন কোন সুরুয়া রান্না করবে, তখন পানি বেশি করে দিবে এবং নিজেদের প্রতিবেশীর প্রতিও খেয়াল রাখবে (মুসলিম)।

দীর্ঘ সময় ধরে আমরা হযরত (সঃ)-এর দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরার ব্যাপারে সামান্য কিছু আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় হলো এই মহান ব্যক্তির পূর্ণ অনুসরণ করা, কারণ খোদাতাআলা বলেছেন, "যদি তোমরা আমাকে পেতে চাও তা হলে এই রসূলের পূর্ণ অনুসরণ কর"।

আমাদের সকলের জীবনের একটা লক্ষ্য অবশ্যই আছে তা হলো আল্লাহ্কে পাওয়া। তাই আল্লাহ্কে পেতে হলে প্রথমে রসূলে করীম (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে, তা হলেই আমরা আল্লাহ্কে পেতে পারি। এ পৃথিবীতে যিনি সবচে' বেশি রসূল করীম (সঃ)-কে অনুসরণ করেছেন তিনি হলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)। রসূল করীম (সঃ)-এর ঐশী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে আজ এ পৃথিবীতে আলো ছড়াচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই যুগের প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আঃ)।

রসূল করীম (সঃ)-এর প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কবিতায় লিখেছে ঃ

"মুস্তাফা পর তেরা বেহদ হো সালাম আওর রহমত
উসমে ইয়ে নূর লিয়ে বারে খুদায়া হামনে,
রাবৃত হ্যায় জানে মুহাম্মদ মে মেরি জাঁকো মোদাম
দিল কো উহ্ জাম লাবা লাব হ্যা পিলায়া হামনে।"

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর তোমার সালাম ও রহমত হোক, তার থেকেই এই নূর আমরা লাভ করেছি, হে খোদা!

মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রাণের সাথে আমার প্রাণ এক সুত্রে বাঁধা, আমি আমার আত্মাকে মুহাম্মদী সুধা খুব পেট ভরে পান করিয়েছি।

আরেক স্থানে তিনি (আঃ) বলছেন, রসূল করীম (সঃ)-এর স্মরণে ঃ

"উস নূর পর ফিদা হুঁ উসকা হি ম্যায় হুয়াহু
উহ্ হ্যায় ম্যায় চীজ কিয়া হুঁ বাস্ ফয়সালা এহি হ্যায়"।

অনুবাদ ঃ আমি এই নূরের মধ্যে নিজকে বিলুপ্ত করেছি আমি তাঁরই হয়ে গেছি।

তিনি আসল। আমি তো কিছুই না। ইহাই শেষ মীমাংসা।

উপরে কবিতাংশ থেকে বুঝা যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কীরূপ ভালবাসতেন রসূল করীম (সঃ)-কে। তাই আমাদের উচিত রসূল করীম (সঃ)-এর উম্মত হিসেবে নিজেদের জীবনে তাঁর শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করা। তাঁর চরিত্রকে তাঁর জীবনকে নিজেদের জীবনের পাথেয় করি তা হলেই আমরা পঙ্কিলতামুক্ত হতে পারবো, পাপমুক্ত হতে পারবো। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করার তৌফীক দিন, (আমীন)।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-পুস্তকের সাহায্যাবম্বনে]

- মাহমুদ আহমদ সুমন

হে মসীহে মাওউদ!

মরহুম মৌলভী ছলিম উল্লাহ্ সাহেবের কবিতার লাইন দিয়েই আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আরম্ভ করছি- হে মসীহে মাওউদ- সালাম আজিকে, তোমার সকাশে, মাহ্দীয়ে মাসউদ! হে মসীহে মাওউদ। বহু পরদার অন্তরালে ঢাকা ছিল ইসলাম। দিবানিশি তুমি, 'মুসেহ' করিয়া দেখালে সে ইসলাম। সত্যিকার অর্থে শেষ জামানায় ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর দ্বারাই যে ইসলাম পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তা-ই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহান আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা সাফ্ফ এর ১০ নম্বর আয়াতে বলেছেন, **হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলুল্লাহ্ বিলহুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু 'আলাদ্দীনে কুল্লিহী ওয়া লাও কারিহাল মুশরেকীন** অর্থাৎ তিনিই তার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেন। মুশরিকগণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন। শেষ জামানায় ইসলামের কি করুণ দশা হবে তাহা মুহাম্মদ (সঃ)ই বায়হাকী মিশকাতে বলে দিয়েছেন, "ইয়াতি আলান্নাসে যামানুন লা ইয়াব্কা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইস্মুহু ওয়ালা ইয়াবকা মিনাল কুরআনে ইল্লা রাসমুহু মাসাজিদুহুম আমেরাতুন ওয়া হিয়া খারাবুম মিনাল্ হুদা-উলামাউহুম শাররুমমান তাহ্তা আদিমিসসামায়ি মিন ইন্দিহিম তাখ্রুজুল ফিত্নাতু ওয়া ফিহিম তাউউদ্" অর্থাৎ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই উহা ফিরে যাবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে আজ জগতের অবস্থা লক্ষ করুন ইসলাম কোথায়? আমাদের উপরোল্লিখিত কবি লিখেছেন, "কেন ওরে ইসলাম আঁখি কোণে তোর জল - জরাজীর্ণ হ'ল কেন সুন্দর দেহ বল? আফ্সোস আজ ইসলামের নামে যে সন্ত্রাস চলছে, রাজনীতি চলছে সবই নেতার অভাবে। তাই তিনি আরও বলেছেন, "দীন ইসলাম আজ কান্ডারীহীন, খলীফা নাহিক তার, হিজরী সনের তের শতাব্দী ধীরে ধীরে হ'ল পার।

হানাফী শাফেরী শিয়া ও সুন্নী মালেকী ও হাম্বলী
নানাবিধ নামে, বাহাত্তর ভাগ, করিয়াছে দলাদলি
"ইসলামের এই দুর্দশা দেখে, আল্লাহ্ রহমান,
উথলিয়া উঠে করুণা সাগর, করিলেন দয়াদান,
মসীহে মাওউদ ইমাম মাহ্দীকে পাঠালেন ধরাধামে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মজাদ্দিদ, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী আল্লাহ্র নির্দেশে করেছেন। তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ তারিখে আল্লাহ্তাআলার হুকুমে বয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ জামাত আল্লাহ্র ফযলে ১৭৬টি দেশে প্রায় পাঁচ হাজার শাখায় বিস্তার লাভ করেছে। এ জামাতের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে উগ্রপন্থী মৌলবাদীদের কাফের ফতোয়াকে উপেক্ষা করে ক্রমাগতভাবে জামাত এগিয়ে চলছে। শত বাধা-বিপত্তি এ জামাতের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারছে না। বরং দিনের পরে দিন উন্নতিই করে চলছে।

মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, **"ইন্নাল্লাহা ইয়াবয়াসু লি হাযিহিল উম্মাতি 'আলা রাসে কুল্লে মিয়াতে সানাতি মাঁইউযাদ্দিদু লাহা দীনাহা"** (আবূ দাউদ ২য় খন্ড) অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্য এমন মহা পুরুষকে আবির্ভূত করবেন যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। আহমদী মুসলমানরা উক্ত হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ বা ধর্মীয় সংস্কারকগণের আগমনে বিশ্বাসী। আহমদীরা উমর বিন আব্দুল আজীজ, ইমাম শাফেয়ী, আব্দুল কাদের জিলানী, সৈয়্যদ আহমদ সারহিন্দী, সৈয়দ আহমদ বেরেলবী সহ শতাব্দী শ্রেষ্ঠ উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার বরেণ্য ব্যক্তিদিগকে মুজাদ্দিদ হিসাবে মান্য করে থাকে। ধর্মের পুনরুজ্জীবন বা সংস্কার কার্য সাধনের জন্যই মুজাদ্দিদগণ আবির্ভূত হন। কিন্তু চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদে আযম ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দ্বারা "খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত বা নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত ছিল। সেই কারণে ১৯০৮ইং সনে ২৬শে মে তারিখে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) মৃত্যুর পর ২৭শে মে, ১৯০৮ইং হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খেলাফতের ধারা অব্যাহত আছে। বর্তমানে ৪র্থ খেলাফতের খলীফা হিসাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) হিসাবে ইসলাম তথা আহমদীয়তের প্রচার কার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের নমুনা পৃথিবীতে বিরল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর শুভাগমনে মহানবী (সঃ)-এর মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সগৌরবে পূর্ণতা লাভ করেছে। এজন্যই আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরোধিতা করে কেউই সফলতা অর্জন করতে পারবে না। ইলাহী জামাতের বিরোধিতা করে পূর্বে যেমন কেউই সফল হয় নি, বর্তমানেও কেউ সফল হবে না। সত্যের বিজয় হবেই হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "মানলাম ইয়ারিফ ইমামা যামানাহি ফাকাদ মাতা মীতাতাল জাহেলিয়াত" অর্থাৎ যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে জাহেলিয়তের (অজ্ঞতার) মৃত্যু বরণ করবে (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। জাহেলিয়তের মৃত্যু নিশ্চয় কারো কাম্য হতে পারে না। যামানার ইমামকে মান্য করার গুরুত্ব খুবই অপরিসীম। তাই বিশ্বের সকল আহমদীয়া মুসলিম জামাত ২৩শে মার্চ তারিখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন ও জামাত প্রতিষ্ঠা হিসাবে মসীহ্ মাওউদ দিবসের কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে আসছে। যেদিন ৪০ জন নতুন বয়াতের মাধ্যমে এ জামাতের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল আর আজ বিশ্বের কোণে কোণে এ জামাতের কোটি কোটি লোক ইসলামের জয়গান গাইছে।

ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের মহান ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রণীত তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন পুস্তকে বলেন, "আজ হতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষমান কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)] আমি তো বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন ইহা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।

বৃক্ষের পরিচয় তার ফল থেকে পাওয়া যায়। যদি আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত না হ'ত তবে নমরূদ, সাদ্দাদ ও ফেরাউন প্রমুখ বাদশাগণের ন্যায় ফয়সাল, ভুট্টো, জিয়া যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছিল তাতে এ জামাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কথায় বলে, "রাখে আল্লাহ্ মারে কে?" সবশেষে মহান আল্লাহ্তাআলা বিশ্বের অবক্ষয় সন্ত্রাস ও মৌলবাদী হতে আমাদের রক্ষা করুন এবং সত্যিকার মাহ্দীর হাতে বয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রেরিত ইসলাম ধর্মের খেদমত করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম

আদর্শ নবী মুহাম্মদ (সঃ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী আলোচনা করার পূর্বে একটু পিছনে দেখি তাঁর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে কী ছিল অবস্থা বিশেষ করে সেই (আরব জাতির) দুনিয়ার। মানুষগুলো নিজেদের খেয়াল খুশীমত চলা শুরু করেছিল। প্রচলিত রীতি-নীতি ও নিয়ম না মেনে চলাকেই তারা জীবনের পথে সবচেয়ে বড় সাফল্য মনে করতো। তারা আল্লাহ্‌র হুকুমের পরওয়া করতো না, তারা দেব-দেবীর পূজা করতো। পাথর ও মাটির মূর্তি তৈরী করতো। দেব-দেবীর নামে মানত করতো। পশু বলি দিত। গাছ-পালা, পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, জীব-জন্তু জড় এ সব কিছুর মধ্যে বিস্ময়কর কিছু দেখতে পেলেই তারা পূজো করতো। মোটকথা মানুষের গোমরাহীর আর শেষ ছিল না।

সমাজে কুকর্ম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মানুষ নিজেদের মধ্যে হানা-হানি কাটা-কাটিতে মত্ত ছিল। গোত্রে গোত্রে, ঘরে ঘরে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঝগড়া-বিবাদ সব সময় লেগে থাকতো। আর তারা মদ পান করতো। জুয়া খেলতো, চুরি ডাকাতি করতো, শুধু এসব কুকর্মগুলি করে তারা ক্ষান্ত হত না বরং তারা এ নিয়ে গর্ব করে বেড়াতো। মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, ধোঁকা দেয়া তাদের পেশায় পরিণত হয়েছিল। এতীম ও বিধবাদের কষ্ট দিতো। অন্যের গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করতো। মুসাফীরদের সহায়-সম্বল লুট-পাট করে নিতো। আর সমাজে নারীদের কোনো মূল্য বা সম্মান ছিল না। তাদের ইজ্জত ও আবরূর কোন দাম ছিল না। মেয়ে -সন্তানের জন্মকে অসম্মানজনক মনে করা হতো। মেয়েদের জীবিত কবর দেয়া হতো।

মানুষের জীবনেরও কোনো মূল্য ছিল না। কথায় কথায় মানুষকে হত্যা করা হতো। মানুষকে গরু ছাগলের মতো বিক্রি করা হতো। এক কথায় বলতে গেলে এমন কোন খারাপ কাজ ছিল না, যা তারা করতো না।

তেমনি এক নষ্ট পরিবেশে আমাদের প্রিয় নবী রবিউল আওওয়াল মাসে দুনিয়ার বুকে আগমন করেন। সেদিন ছিল সোমবার। রাত্রি ও দিনের মাঝা-মাঝি সময়ে অর্থাৎ ভোর বেলায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের কিছুদিন আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। দাদা আব্দুল মুত্তালিব প্রিয় নবীর জন্মের খবর শুনে অত্যন্ত খুশি হন। তিনি তাকে কোলে উঠিয়ে নেন। তাঁকে আদর করেন। তাঁকে কা'বা ঘরে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দোয়া করেন। তারপর শিশুকে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন। আর তিনি শিশুর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ'। এ নামের অর্থ সবচে' বেশি প্রশংসিত। লোকেরা এ নাম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি চাই দুনিয়ার সবাই তাঁর প্রশংসা করুক। আল্লাহ্ তাঁর এ আশা পূর্ণ করেন।

যেহেতু মক্কায় দাই প্রথার প্রচলন ছিলো তাই প্রিয় নবীকেও দাই হালিমার সাথে তাঁর গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বিবি হালিমা যেমন সৎ ছিলেন তেমনি তার স্বভাবও ছিল মধুর। তিনি প্রিয় নবীকে বুকের দুধ এবং অন্তরের স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেন। গ্রামে-তাজা হাওয়ায় ও উন্মুক্ত পরিবেশে প্রিয় নবী বেড়ে উঠতে থাকেন। তার মিষ্টি ও সুন্দর চেহারা দেখে সবাই তাঁকে স্নেহ করতো, ভালবাসতো। তাঁর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে সবাই খুব খুশী হতো। তাঁর মধুর ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হতো। ৬ বছর বয়সে বালক নবীর মা মারা যান। তিনি এতীম হয়ে পড়েন। জন্মের পূর্বেই তিনি পিতার স্নেহ-বঞ্চিত হন। আর মাত্র ৬ বছর বয়সে মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন।

অতঃপর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। তিনি প্রিয় নবীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার ছায়ায় বালক নবী বেড়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল মুত্তালিবও মারা যান। মরার সময় তিনি প্রিয় নবীকে আবূ তালিবের হাতে সোপর্দ করে যান। আবূ তালিব ছিলেন তাঁর চাচা। এভাবে তিনি ধীরে ধীরে শৈশব থেকে কিশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করেন। যৌবনে তিনি যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুবক ছিলেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। অন্যান্য যুবকরা ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকতো, জুয়া খেলতো, আড্ডা জমাতো, খারাপ কাজ করে বেড়াতো, মূর্তি পূজা করতো, মিথ্যা কথা বলতো, মানুষের সাথে অসদ্ব্যবহার করতো, কিন্তু প্রিয় নবী এসব থেকে নিজে বিরত থাকতেন এবং অন্যকেও বিরত থাকার নসীহত করতেন।

মক্কায় লোকদের জুলুম-অত্যাচার বেড়ে যাচ্ছিল, এসব দেখে প্রিয় নবী মনে বড় ব্যথা পেতেন। তিনি চিন্তা করতেন কেমন করে এসব দূর করা যায়, কেমন করে সমাজ হতে অসৎকর্ম নির্মূল করা যায়। তিনি যুবকদেরকে বুঝালেন। তাদেরকে দিয়ে সমিতি গঠন করলেন। আর সমিতির নাম হল 'হি-লফুলফযূল'। আর এই সমিতির প্রত্যেক যুবক এই বলে শপথ নিলো যে, "আমরা দেশ হতে অশান্তি দূর করবো, মুসাফীরদের রক্ষা করবো। দরিদ্রদের সাহায্য করবো। কারও উপর জুলুম হতে দেবো না।"

প্রিয় নবী মক্কার অনতিদূরে হেরা গুহায় গিয়ে খোদার স্মরণ করতেন। ইবাদত করতেন। আর মানুষকে কীভাবে সৎপথে আনা যায় এবং কীভাবে মানুষের মঙ্গল হবে সে চিন্তা করতেন। অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাঁকে পথ দেখালেন। আল্লাহ্ তাঁকে রসূল বানালেন। আল্লাহ্ জিব্রাইল (আঃ) মারফত তার বাণী শুনালেন। তিনি দুরু দুরু মন নিয়ে গৃহে ফিরলেন। বিবি খদীজা (রাঃ)-কে সব কথা শুনালেন। বিষয় খদীজা (রাঃ) বুঝতে পারলেন। কিন্তু প্রিয় নবীর মুখে আশংকার ছাপ দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনাকে ধ্বংস করবেন না। কেননা আপনি সৎকাজ করেন, সদকা দেন, দরিদ্রকে সাহায্য করেন, এতীম ও বিধবাদের সাহায্য সহায়তা করেন, অতিথিসৎকার করেন, মানুষের বোঝা উঠান, দুঃখীর দুঃখ দূর করেন। আপনার ভয় কিসের?" আল্লাহ্‌র বাণী আসতে লাগলো। প্রিয় নবী সে বাণী মানুষের নিকট পৌছাতে লাগলেন। মানুষকে বললেন ঃ

আল্লাহ্ এক। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তিনিই রিযিক দাতা। তিনিই শাসক। তার আদেশ মেনে চলে। তাঁরই ইবাদত করো। আমি তাঁর রসূল। আমার অনুগত হও। অসৎ কাজ হতে বিরত থাকো। সৎ কাজ করো। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। এবং তোমাদের পুরস্কার প্রদান করবেন। আর অসৎ লোকদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন, তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

ভালো লোকেরা তাঁর কথা মানলো। ঈমান আনলো কিন্তু যারা তাঁকে সত্যবাদী বলে জানতো সবদিক দিয়েই সৎ জানতো তারা ঈমান আনলো না। তারা তাঁকে বিদ্রূপ-উপহাস করতে লাগলো। তাঁকে গাল-মন্দ দিতে থাকলো। তারা তাঁর শত্রু হয়ে গেলো। তারা তাঁকে ভয় দেখালো, ভয় তিনি পেলেন না। তারা শাঁসালো। তিনি দমলেন না। লোভ দেখালো। তিনি ভুললেন না। ব্যর্থ হবার পর

তারা তাঁকে কষ্ট দিতে এবং জুলুম চালাতে লাগলো। রাস্তায় তাঁকে বিরক্ত করতো। গাল দিতো। খারাপ খারাপ কথা বলতো। তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করতো। তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো। তাঁর উপর ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করতো।

প্রিয় নবী সবর করতেন। আর তাদের জন্য দোয়া করতেন যেন তারা হেদায়াত লাভ করে। এভাবে আবূ জাহল থেকে শুরু করে কুরাইশ সর্দাররা দেখালো যে, মানুষ তাদের খোদায়ী অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র অনুগত হচ্ছে। তাদের সর্দারী অস্বীকার করে প্রিয় নবীকে সর্দার মানছে। তাই তারা ইসলামকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালালো। কিন্তু বিরোধীদের ফুৎকারে ইসলামের প্রদীপ নিভে যেতে পারে না। আল্লাহ্ নিজেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। তাই এই ব্যাপক অত্যাচারে মুসলমানরা মোটেই ঘাবড়ালো না। তারা সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দীনের উপর অবিচল রইলো।

প্রিয় নবী খুব ভাল ছিলেন। তিনি সবচেয়ে ভালো ছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত সৎগুণ তাঁর মধ্যে ছিল। পুরো মাত্রায় ছিল। তাই তাকে বলা হয় "খয়রুল বাশার" অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ নিজেই কুরআনে তাঁর প্রশংসা করেছেন। জনৈক সাহাবা প্রিয় নবীর প্রিয় স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। প্রিয় নবী কেমন ছিলেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "তুমি কুরআন পড়ো নি? (কুরআনে যে সব সৎগুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সবগুলিই তাঁর মধ্যে ছিল) তিনি কুরআনের যথার্থ নমুনা ছিলেন।" তিনি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। নাপাকি হতে দূরে থাকতেন। পরিচ্ছন্নতাকে তিনি ঈমানের অর্ধাংশ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি গোসল করতেন। পাক-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতেন। সুগন্ধি লাগাতেন। চোখে সুরমা লাগাতেন। চুল আঁচড়াতেন। প্রত্যেক দিন কয়েকবার মেসওয়াক করতেন।

আগ্রহ সহকারে আহার করতেন। কখনো কোন খাদ্যের নিন্দা করতেন না। সব সময় সামনে থেকে খেতে শুরু করতেন। নিজের কাজ নিজে করতেন। কারও সাহায্য নিতেন না। অন্যের কাজও করে দিতেন। পশুদের আহার দিতেন। সেবা করতেন। দুধ দুহাতেন। ঝাড়ু দিতেন; আটাগুলে খামির তৈরী করতেন। কাপড় ধুইতেন বাজার হতে সওদা কিনে আনতেন। জুতা সেলাই করতেন; ঘর মেরামত করতেন। কখনো বেকার বসে থাকতেন না। সব সময় কাজের মধ্যে থাকতেন।

নিজের কাজ নিজে করতেন। নিজের কাজে অন্যের সাহায্য নেয়া পসন্দ করতেন না।

খুবই সাদাসিদে থাকতেন। পুরুষদের সোনা ও রেশম পরতে মানা করতেন। মোটা কাপড় পরতেন। মামুলি বিছানায় শুতেন। কখনো পিঠে চাটাইয়ের দাগ লেগে যেত। তিনি বড়দের অত্যন্ত সম্মান করতেন। একবার তার দুধ-মা আসলেন তিনি তাঁকে খুব খাতির যত্ন করলেন। তাকে বসার জন্য নিজের মাথার পাগড়ী বিছিয়ে দিলেন। দুধ ভাই আসল তিনি তাদের সম্মানার্থে দাঁড়ালেন এবং তাকে নিজের সামনে বসালেন।

ওয়াদা করলে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করতেন। তিনি কারোর উপর প্রতিশোধ নিতেন না। মক্কাবাসীরা তাঁকে এত উৎপীড়ন করলো। গালাগালি দিলো। মারপিট করলো। তাঁকে গৃহ ছাড়া করলো। দেশ ছাড়া করলো। হত্যা করতে উদ্যত হলো, কিন্তু তাদের নিজের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তিনি কাউকে কিছু বললেন না। সবাইকে মাফ করে দিলেন। তায়েফবাসীরা তাঁকে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করেছিল সমস্ত শরীর এবং তিনি প্রচন্ড রকম আহত হয়েছিলেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর যখন তাদের প্রতিনিধি আসলো তিনি তাদেরকে যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। আর এ জন্যই প্রিয় নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গোলাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মহানবী (সঃ) সম্পর্কে রূহানী খাযায়েন পঞ্চম খন্ড; ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখেন। "সেই সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতিঃ যা মানবকে অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে দেয়া হয়েছে তা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না। নক্ষত্র রাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না। তা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীসমূহে ছিল না। তা মুক্তা মানিক্য পান্না, মতিতেও ছিল না। বস্তুত তা পৃথিবী ও আকাশের কোন বস্তুতেই ছিল না। কেবল মাত্র মানবের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে। তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম সর্বোত্তম ও সুন্দরতম অস্তিত্ব আমাদের নেতা ও প্রভু নবীগণের নেতা অমর জীবন প্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। অতএব এই জ্যোতিঃ পূর্ণ মানবকে দান করা হয়েছে। এবং মর্যাদা হিসাবে তাদিগকেও কিছু দান করা হয়েছে যারা তারই মতন কিছু গুণ রাখত এবং রাখে এই মর্যাদা উচ্চতা এবং পূর্ণতাসহ এবং পূর্ণাঙ্গীণভাবে কেবল মাত্র আমাদের নেতা ও প্রভু আমাদের হাদী, নবী উম্মী 'সাদেক' ও 'মাসদুক' মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যেই পুঞ্জীভূত। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেন, রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খন্ড, ১০ পৃষ্ঠায় "আরবের অরণ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি অল্প কিছু দিনের মধ্যে জীবিত হয়ে গেল। অতীতের বিকৃত মানুষগুলো খোদার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে গেল। অন্ধরা চক্ষুস্মান হলো, মুকদের কণ্ঠে খোদার তত্ত্বজ্ঞান জারী হল। পৃথিবীতে একবারই এরূপ বিপ্লব ঘটল যে, পূর্বে না কেউ ইহা দেখিয়েছে, না কেউ শুনিয়েছে। তোমরা কি জান, উহা কি ছিল? উহা একজন ফানা-ফিল্লাহ্' (যিনি আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়েছেন)-এর অন্ধকার গভীর রাত্রির দোয়াই তো ছিল। তিনি পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দিলেন এবং ঐ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেন। যা নিরক্ষর অসহায় ব্যক্তির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। তিনি মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম আরো লিখেন 'রূহানী খাযায়েন ২২ খন্ড,' ১১৪ পৃষ্ঠায় ঃ

আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি, এই আরবীয় নবী যাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মাদ। হাজার হাজার দুরুদ ও সালাম তাঁর উপর তিনি যে কত উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয় এবং তার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। খোদাতাআলা যিনি তাঁর (সঃ) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েজ ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।"

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মহানবী (সঃ) এ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ সেরা মানুষ ছিলেন। তিনি সমস্ত মানব জাতির জন্য ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন। তিনি আমাদের খোদা পর্যন্ত পৌছাব, খোদার ভালবাসা অর্জন করার ও তার প্রিয় হওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ কি চান তিনি আল্লাহ্ কিসে সন্তুষ্ট হন, কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন, সে কথা তিনি (সঃ) আমাদের জানিয়েছেন এবং নিজে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করে দেখিয়েছেন তাঁর (সঃ)-এর মাধ্যমে মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদ লাভ করেছি,

তিনি ইসলামের ঐশ্বর্যে আমাদের ভান্ডার ভরে দিয়েছেন। তিনি (সঃ) যদি না আসতেন এ পৃথিবীতে তাহলে জানি না আমাদের কি দশা হ'ত হয়তো আমরা কখনো এদিক আবার ওদিকে ছুটা ছুটি করে মরতাম। সঠিক পথের দিশা হয়তো কোন দিন পেতাম না। কখনো অন্যের উপর জুলুম করতাম, আবার কখনো নিজের উপর জুলুম করতাম। দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট পেতাম, আর পরকালেও ভুগতাম (শাস্তি পেতাম) লাঞ্ছিত হতাম, কিন্তু মহানবী আমাদের দীন ও দুনিয়ার ধ্বংস থেকে মুক্তি পাওয়ার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। কাজেই মহানবী (সঃ)-এর প্রতি আমরা যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা অতি সামান্য বলে বিবেচিত হবে। প্রিয় নবীর আগমনের পূর্বে দুনিয়াতে তেমন কোন অপকর্ম ছিল না যা মানুষ করত না। কিন্তু প্রিয় নবী খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার, ভালো কাজ করার এবং সৎ ও উত্তম মানুষ হয়ে জীবন যাপন করার শিক্ষা প্রদান করেন।

প্রিয় নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে দীন ও দুনিয়ার সে উপকার আমরা লাভ করেছি তার প্রতিদান কীভাবে দিতে পারি। এভাবেই দেয়া সম্ভব। তিনি (সঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু এনেছেন (শিক্ষা-দীক্ষা) সবকিছু আমরা মনে-প্রাণে মেনে নেবো। তার জীবনকে আমাদের জীবনের জন্য আদর্শ বলে গ্রহণ করবো। তাঁর (সঃ) হুকুম মেনে চলবো। তিনি খুশি হন সন্তুষ্ট হন এমন সব কাজ (কর্ম) আমরা করবো। তিনি যা অপসন্দ করেছেন, যেগুলি হতে দূরে থাকবো। তিনি যা পসন্দ করেছেন তাই করবো। সত্যের প্রচার করণার্থে তিনি দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা সয়েছেন। আমরাও সত্যের দাওয়াত সমস্ত দুনিয়ায় ছড়াবো, মানুষকে সৎ কাজে উৎসাহিত করবো। খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবো। আর এসব কাজ শুধু মাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট রাখার জন্য করবো। তার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক অথবা প্রতিদান কারোর নিকট হতে আশা করবো না। তাই প্রিয় নবীর কথাকে মেনে নিয়ে তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা, সম্মানের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা, তাঁর নাম শুনা মাত্রই দুরূদ ও সালাম পড়া, নিজে দুরূদ পড়া এবং অপরকেও দুরূদ পড়ার জন্য (তাগিদ দেয়া) উৎসাহিত করা।

মহান আল্লাহ্ আমাদের ছোট বড় সবাইকে মহা নবী প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করার মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি, খোদার প্রিয় হওয়ার তৌফীক দান করুন, আমীন।

আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মুহাম্মাদীঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

- **এস. এম আব্দুল হক**, মোয়াল্লেম

সংবাদ

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ
৬ষ্ঠ বার্ষিক কেন্দ্রীয় কর্মশালা ২০০২-এর প্রতিবেদন

আল্লাহ্‌তাআলার অপার অনুগ্রহক্রমে পরিবর্তিত সময়সূচী মোতাবেক ১লা মে, ২০০২ ইং রোজ বুধবার বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত দিনব্যাপী মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কর্মশালার কার্যক্রম ২টি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ও ২য় অধিবেশন বিকাল ২.৩০ মিঃ থেকে ৪ ঘটিকা। উভয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশ্বেরুর রহমান, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। তিনি আনসারুল্লাহ্‌র আহাদ পাঠ করেন। ১ম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার উদ্বোধনী ভাষণে আনসারদের শপথ বাক্য অনুযায়ী খলীফা (আইঃ), নেযামে খেলাফতের প্রতি অনুরক্ত থেকে মজলিসি ও জামাতি কর্মকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং সেই সাথে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণেরও তাকিদপূর্ণ নসীহত করেন।

উদ্বোধনী ১ম অধিবেশনে জানুয়ারী-এপ্রিল ২০০২ সনের মজলিসের সাধারণ রিপোর্ট পেশ করেন মোহতরম আব্দুল জলিল, কায়েদ উমুমী এবং মোহতরম মসীহ্ উর রহমান, কায়েদ মাল আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন। মোহতরম সদর সাহেবের দিক-নির্দেশনামূলক সভাপতির ভাষণ দ্বারা ১ম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

প্রশিক্ষণ (২য়) অধিবেশনে মোহতরম ফয়েজ উল্লাহ্- রিজিওনাল নাযেম ঢাকা ও মোহতরম অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন রিজিওনাল নাযেম-রাজশাহী, মোহতরম কওসার আলী মোল্লা, জেলা নাযেম-যশোহর কুষ্টিয়া ও মোহতরম খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম, জেলা নাযেম-রংপুর দিনাজপুর কর্মপদ্ধতির উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় কায়েদীগণ যথা উমুমী, মাল, তাজনীদ, তা'লীমুল কুরআন, তা'লীম, তরবিয়ত, তবলীগ, নায়েব সদর সফে আউয়াল যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মসীহ্ উর রহমান, মাহবুব আজম রেজা, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, শফিক আহমদ, আবুল কাশেম ভূইয়া, আজিজুল হক, আফজাল আহমদ খাদেম প্রমুখ সাংগঠনিক ক্লাস নেন। ক্লাস প্রজেক্টরের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত

কর্মশালায় কেন্দ্রীয় আমেলায় ২০ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সদস্য, ৪ জন (সকল) রিজিওনাল নাযেম, ১১টি জেলার মধ্যে ৮ জন জেলা নাযেম, ৮৪ মজলিসের মধ্যে ৪২ মজলিসের যয়ীমে আলা / যয়ীম বা তাঁর প্রতিনিধি ও ৩৯ জন অন্যান্য কর্মকর্তা মোট ১০৯ জন উপস্থিত থেকে কর্মশালাকে সর্বদিক দিয়ে প্রাণচঞ্চল উদ্দীপনাময় ও উৎসব মুখর করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া ২টি নবগঠিত মজলিসেরও ২ জন নতুন পকেটের প্রতিনিধি ও উক্ত কর্মশালায় যোগদান করেন।

মোহতরম সদর সাহেবের মূল্যবান নসীহত ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

- **মোহাম্মদ মাহবুব আজম রেজা**
এডিশনাল কায়েদ উমুমী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামে ১ম নওমোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ০১/০৫/২০০২ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামে ১ম নওমোবায়েঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আল্ হামদুলিল্লাহ্। উক্ত সম্মেলনের ১ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এ সম্মেলনে নওমোবায়েঈন বন্ধু ৩২ জন, জেরে তবলীগ ৫ জন লাজনা জেরে তবলীগ ২ জন এবং নতুন বয়াতকৃত নওমোবায়েঈন লাজনা ১৫ জন সহ মোট ৫৪ জন ভ্রাতা ও ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও পুরানো ২২ জন আহমদী বন্ধু উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে যোগদানকৃত সকল নওমোবাঈন বন্ধু জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে আহমদীয়ত সম্পর্কে পৃথক পৃথক বক্তব্য রাখেন।

- মোঃ নেয়ামত উল্লাহ্
সেক্রেটারী, নওমোবায়েঈন
আহমদীয়া মুসলিম জামাত

মাতা-পিতা দিবস পালন

মহান আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ১৪ই এপ্রিল রোজ রবিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামাতে বাদ মাগরেব হ'ত ইশা পর্যন্ত 'ইয়াওমে ওয়ালেদাঈন, (মাতা-পিতা দিবস) উদযাপন করা হয়। এতে ১০ জন আতফাল, ৩ জন খোদ্দাম এবং ২ জন আনসার সহ সর্বমোট ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। মাতা-পিতার প্রতি সম্মান-ভক্তি সহানুভূতি ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে স্থানীয় কায়েদ জনাব সোহেল আহমেদ চৌধুরী, স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব সাদেক আহমদ, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুন নূর চৌধুরী এবং জনাব আব্দুল্লাহ্ চৌধুরী (লিন্টু)। সবশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উক্ত দিবস সমাপ্ত হয়।

- সোহেল আহমেদ চৌধুরী
স্থানীয় কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া
জামালপুর (হবিগঞ্জ)

রাজশাহী রিজিওন (২) ওয়াকফে নও সন্তান এবং পিতা মাতার বার্ষিক তা'লীম ও তরবিয়ত ক্লাস ও সম্মেলন

রাজশাহী রিজিওন (২) ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়ে ও তাদের পিতা-মাতাদের চতুর্থ বার্ষিক তালীম-তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন ৪/৪/০২ইং হতে ৬/৪/০২ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়িয়া, নাটোর অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে মোট ৭টি জামাতের ১৬ জন ওয়াকফে নও, ১৪ জন মাতা এবং ৯ জন পিতা যোগদান করেন। ৪/৪/০২ইং তারিখে বিকাল ৩-৩০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ন্যাশনাল ওয়াকফে নও সেক্রেটারী মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মুরব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা বশিরুর রহমান এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম-কাম-প্রেসিডেন্ট জনাব আমীর হোসেন সাহেবও বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিভাগীয় সহকারী সেক্রেটারী অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ। ৬/৪/০২ইং তারিখে সর্বমোট ১৬টি বিষয়ে ওয়াকফে নও শিশু (সিনিয়র ও জুনিয়র)। পিতা-মাতাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়া হয়। ওয়াকফে নও শিশুদের মধ্যে আমাতুল হাফিজ ফ্রেন্সীএবং মাতাদের মধ্যে মিসেস শামীম জাহান নাজনীন (বগুড়া) প্রায় সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করেন আমীন। পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সর্বজনাব মাওলানা বশিরুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, জনাব মোয়াল্লেম আমীর হোসেন এবং জনাব মোজাফফর আহমদ রাজু। ৬/৪/০২ বিকাল তিনটায় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে হয়।

- অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ
সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
রাজশাহী বিভাগ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 64 ◆ 21st Issue May 15, 2002 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

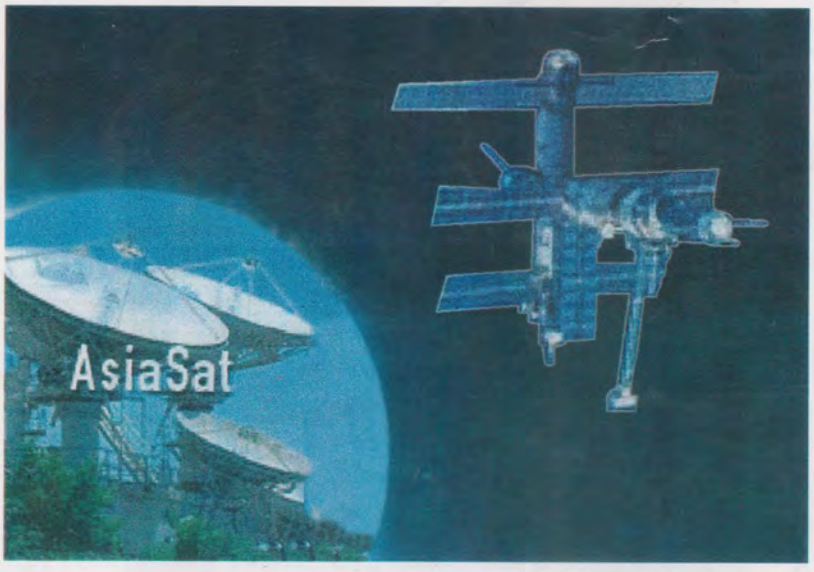

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST
FREQ. - 3660
S.R - 27500
POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com